কিশোর থ্রিলার

চাঁদের অসুখ

রকিব হাসান

তিন বন্ধু

কিশোর • মুসা • রবিন

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

তিন বন্ধু

কিশোর থ্রিলার

চাঁদের অসুখ

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই, আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের;
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

এক

হ্যালোউইনের আগের রাতে ফ্লুতে আক্রান্ত হলো কিশোর আর মুসা। দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো। হ্যালোউইনের জন্যে প্ল্যান মাফিক পোশাক বানানোও আর হলো না।

সুতরাং, হ্যালোউইনের রাতে কোনমতে একটা কিছু বানিয়ে পরে নিল দুজনে। হলুদ একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে হলুদ পাজামা পরল মুসা। বড় একটা প্ল্যাস্টিকের মগের হাতল কেটে ফেলে দিয়ে উপুড় করে মাথায় বসাল টুপির মত করে। টেপ দিয়ে আটকে দিল কপালের সঙ্গে, যাতে খসে না পড়ে।

কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে বসে সাজগোজ করছে দুজনে। রবিন এখনও আসেনি।

মুসার দিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি সাজ হলো?'

'মগা,' জবাব দিল মুসা।

'মগা মানে তো বোকা। তুমি কি বোকা?'

কান চুলকে জবাব দিল মুসা, 'না, বোকা না। একটা কিছু সাজা দরকার, সাজলাম। নাম দেয়া দরকার, দিলাম।'

'ভাল কথা। নামটা মগা না রেখে মগ-বয় রাখো, ভাল শোনাবে।'

'ঠিক! আসলেই আমি বোকা। তুমি কেমন চট করে সুন্দর একটা নাম রেখে দিলে। আমার মাথাতেই আসছিল না।'

কালো একটা পুরানো চাদরের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে দিল কিশোর। আলখেল্লার মত গলা থেকে ঝুলে রইল চাদরটা। চাদরের টুকরো দিয়ে কালো মুখোশ বানাল। হাতে তুলে নিল একটা পুরানো মরচে পড়া তলোয়ার। ইয়ার্ডের জঞ্জাল থেকে খুঁজে বের করে এনেছে।

'তুমি কি সাজলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কালো জলদস্যু। ব্ল্যাক পাইরেট।'

'ভালই হয়েছে, কি বলো?' হাসল মুসা। 'তাড়াতাড়ির মধ্যে এরচেয়ে ভাল আর কি হবে, তাই না?…চলো, বেরোই।'

'রবিন তো এখনও এল না।'

'চলো, বাড়ি থেকে ডেকে নেব।' বেঞ্চে রাখা একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ তুলে নিল সে। ট্রিক-অর-ট্রীট ব্যাগ। লোকের দেয়া উপহার রাখবে এর মধ্যে।

'বেশ, চলো,' আরেকটা ব্যাগ তুলে নিল কিশোর।

বাইরে বেরোল দুজনে। পরিষ্কার রাত। ভীষণ ঠাণ্ডা। হালকা তুষারে চকচক করছে লনের ঘাস। নির্জন ইয়ার্ড। লিভিং রুমের জানালায় আলো। চাচা-চাচী টেলিভিশন দেখছেন। একটু পরেই ট্রে ভর্তি নানা রকম লোভনীয় জিনিস নিয়ে বারান্দায় এসে বসবেন মেরিচাচী। অন্য বাড়ি থেকে আসা ছেলেমেয়েদের ব্যাগে উপহার তুলে দেয়ার জন্যে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'পূর্ণিমা।' মুসার দিকে ফিরল, 'হ্যালোউইনের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালে কি হয়, বলো তো?'

কেঁপে উঠল মুসা। চট করে চোখ সরাল চাঁদের দিকে। 'ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো এখন!'

হাসল কিশোর। 'এ সব বিশ্বাস করো তুমি?'

'দেখো, হাসাহাসি কোরো না। ইনডিয়ানদের অনেক ব্যাপারই অদ্ভুত, ওদের অনেক কিংবদন্তী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।'

'তাই বলে নেকড়ে-মানব হওয়ার কথা আর ফলবে না। একেবারেই গাঁজা।'

'থাক থাক, এখন ওসব আলোচনার দরকার নেই। যে কাজ করতে চলেছি, করিগে। চলো যাই।'

কিন্তু দুই কদমও এগোতে পারল না ওরা। জঞ্জালের একটা স্তূপের ওপাশ থেকে ঘাউৎ করে এক চিৎকার দিয়ে সামনে এসে পড়ল একটা ভয়ঙ্কর জীব। আধা-মানব আধা-জন্তু। চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল একবার। তারপর টলতে টলতে এগোলো। দুই হাত তুলে করুণ স্বরে চিৎকার করে বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বাঁচাও...আমাকে বাঁচাও, ভাই...'

*

'বাবাগো! খেয়ে ফেলল!' বলে চিৎকার দিয়ে দৌড় মারল মুসা।

থাবা দিয়ে কিশোরকে ধরতে এল মূর্তিটা।

ঝট করে সরে গেল কিশোর। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জন্তুটার দিকে। আচমকা লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে জন্তুটার কুকুরে-নাকটা চেপে ধরে মারল হ্যাঁচকা টান।

লম্বা মুখোশটা খুলে এল তার হাতে। 'রবিন!'

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে গেছে মুসা। ফিরে তাকাল। ভালমত দেখল একবার। ফিরে এসে বলল, 'উফ্, জানে একেবার ধুকপুকানি তুলে দিয়েছিলে!'

'তারমানে সাজটা নিখুঁত হয়েছে,' হেসে বলল রবিন। কিশোরের হাত থেকে আবার নিয়ে নিল মুখোশটা। 'রাস্তায় যে দেখবে সেই ভয় পাবে। আসার সময় দেখে এলাম শুঁটকিরাও বেরিয়েছে ব্যাগ নিয়ে। শুঁটকি আর টাকি।'

'কি সাজল?' মুসার প্রশ্ন।

'ভাঁড়। দুজনেই। পোশাকের রঙ আলাদা।'

'ভাঁড়ই ও দুটো। ভয় দেখাওনি?' মুসার প্রশ্ন।

'না, বুঝতে পারিনি এতটা নিখুঁত হয়েছে আমার সাজ। তোমাদেরকে দেখানোর পর শিওর হলাম।'

'তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম। সময়মত এসে গেছ,' কিশোর বলল, 'চলো, আমরাও বেরোই।'

দুই

'চলো, ওদিকটায় যাওয়া যাক আগে,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল টেরি। 'রাস্তার মাথা দিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্য রাস্তায় পড়ব।'

'টেরি, কি মনে হয় তোমার?' টাকি বলল। 'আপেল-টাপেল আবার দেবে না তো কেউ? ও জিনিসটা দুচোখে দেখতে পারি না আমি। তারচেয়ে টক লেবেনচুষ দিলেও ভাল।'

'দিতেও পারে,' মুখ বাঁকাল টেরি। 'রকি বীচের সবগুলান তো কিপটে। আমি টক লেবেনচুষও দেখতে পারি না। মুখে দিলেই চুকার ঠেলায় গাল-মুখ বাঁকা হয়ে যায়।...দিলে আর কি করব, নিয়ে এসে ফেলে দেব।'

'কিন্তু হ্যালোউইনের উপহার ফেলা তো ঠিক না।'

'কে আর দেখতে যাচ্ছে। চোখে না দেখলে সবই ঠিক।'

ক্যান্ডির আলোচনা করতে করতে রাস্তার প্রথম ব্লকটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। প্রথম বাড়িটা থেকে দিল ছোট ছোট হারশি চকোলেট বার। দ্বিতীয়টা থেকে দুই ব্যাগ ক্যান্ডি কর্ন। তৃতীয়টা মিলকি ওয়ে ক্যান্ডি।

খুশি হলো দুজনে। শুরুটা চমৎকার।

ঘণ্টাখানেক ধরে বাড়ি বাড়ি ঘোরার পর ওদের ট্রিক-অর-ট্রীট ব্যাগগুলো বোঝাই হয়ে গেল। ফুলে উঠে ফেটে পড়তে চাইছে।

'চলো, বাড়ি চলে যাই,' টাকি বলল। 'অনেক হয়েছে। বাড়ি গিয়ে খাওয়া শুরু করা দরকার।'

'চলো,' বলেই আরেকটা বাড়ির ওপর নজর পড়ল টেরির।

টেরির দৃষ্টি অনুসরণ করে টাকিও তাকাল সেদিকে। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায়, শেষ ব্লকটা থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে পুরানো, ভাঙাচোরা পোড়ো দুর্গের মত বাড়িটা। ঘন গাছপালা, লতাপাতায় ঘেরা। দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে, গা ছমছম করে; রাতের বেলা তো সাংঘাতিক। 'ওটা বাকি রয়ে গেল। গিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

খপ করে টেরির হাত চেপে ধরে টান মারল টাকি, 'টেরি, দোহাই তোমার! বাড়ি চলো!...ওটা মিসেস জোরোবেলের বাড়ি।'

'সেজন্যেই তো যেতে চাইছি,' টাকির হাতটা ছাড়িয়ে নিল টেরি। 'চলো, দেখি, মিসেস জোরোবেল কি দেয়?'

'না না, প্লীজ!' অনুরোধ করতে লাগল টাকি। 'তুমি জানো, ওখানে যাওয়াটা উচিত হবে না আমাদের।'

'কেন হবে না?'

'আমাদের দেখতে পারে না বুড়ি। বল মেরে যে জানালার কাঁচ ভেঙে দিয়েছিলে, ভুলে গেছ?' পাগলের মত চেঁচানো শুরু করেছিল মহিলা। পুলিশ ডাকার হুমকি দিয়েছিল। মহিলার উগ্রমূর্তির কথা কল্পনা করে শিউরে উঠল টাকি।

'ভুলব কেন? বলটা ফেরত দেয়নি, সে-কথাও মনে আছে। দেখি, আজ ক্যান্ডি এনে খানিকটা উসুল করতে পারি কিনা।'

'ক্যান্ডি দেবে কে বলল তোমাকে? বুড়ি আমাদের ঘৃণা করে।' টেরিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আবার তার হাত ধরে টানল টাকি।

'বুড়ি আমাদের চিনবে কি করে?' না দেখে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই টেরির। 'মুখে আমাদের মুখোশ। চলো। দরজায় গিয়ে টোকা দিয়ে দেখি, কি ঘটে। কোন্ ধরনের ক্যান্ডি আমাদের উপহার দেয় বুড়ি।'

'আমি যাব না।' মুখোশ খুলে নিল টাকি। কপালে ঘাম চকচক করছে। 'ও বাড়ির ধারেকাছে যাব না আমি। বুড়িটা পাগল। তুকতাক জানে। বিপজ্জনক। লোকে বলে, ডাইনী।'

হেসে উঠল টেরি। 'হুঁ, ডাইনী না কচু! নাকি তুমি ভাবছ, গিয়ে দেখবে ডাইনীর ঝাঁটায় চড়ে চাঁদের মুখো হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে বুড়িটা?'

'সত্যি সে ডাইনী!' বোঝানোর চেষ্টা করল টাকি। 'আমাদের পাশের গলির মিসেস ডুগানকে জাদু করেছিল। চোখের পাতা ফেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মিসেস ডুগানের। বন্ধ আর করতে পারে না। বোঝো, ঘুমাতে কি রকম কষ্ট হয়!'

টেরির হাত ধরে টান দিল আবার সে। 'চলো, বাড়ি গিয়ে গুণে দেখি ক'টা ক্যান্ডি পেলাম। আর কি কি জিনিস।'

'মাত্র তো একটাই বাড়ি,' টাকির হাত ছাড়িয়ে নিল টেরি। 'এসো। আজকে হ্যালোউইন। এমনিতেই ভয়ের রাত। আরেকটু ভয় নাহয় পেলামই।'

দ্রুত হাঁটতে শুরু করল টেরি।

'আমি এখানেই থাকি,' টাকি বলল। 'তুমি গিয়ে দেখে এসো...'

'দূর! এসো তো!'

রাস্তার একপাশ ধরে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল টেরি আর টাকি। টেরি আগে, টাকি পিছে। দুজনের হাতে উপহারে বোঝাই ভারী ব্যাগ।

গেটটা খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজনে। দুই পাশে আগাছায় ভরা খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোল সদর দরজার দিকে।

বাঁশের কঞ্চি আর রঙিন কাগজ দিয়ে বানানো বিশাল একটা কুমড়ো রেখে দেয়া হয়েছে বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে। মোম জ্বেলে দেয়া হয়েছে ভেতরে। দরজার ওপরে ঝুলছে কৃত্রিম মাকড়সার জাল। দরজার পাল্লার ওপর দিকের খুদে একটা জানালা দিয়ে আলো আসছে।

'টেরি,' শেষবারের মত সাবধান করল টাকি, 'ও আমাদের ঘৃণা করে!'

'চিনছে কি করে? বল মেরেছিলাম, সে তো বহুতদিন। মুখোশের ভেতর দিয়ে চিনতে পারবে?'

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল টেরি। টাকি দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির গোড়ায়। বিপদ দেখলেই দৌড় দেবে।

বেল বাজাল টেরি।

বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুনল না। জোরে জোরে থাবা মারতে লাগল দরজায়।

কয়েক সেকেন্ড পর পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

ব্যাগটা সামনের দিকে তুলে ধরল টেরি।

কুট করে তালা খোলার শব্দ হলো। তারপর ধীরে, অতি ধীরে খুলে গেল পাল্লাটা।

তিন

'কে?' সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিল মিসেস জোরোবেল। মৃদু আলো আসছে তার হলওয়ে থেকে।

মহিলার মুখটা গোল। মসৃণ চামড়া, বয়স হলেও বয়স্কদের মত ভাঁজ নেই। বড় বড় কালো চোখ। লিপস্টিক লাগানো লাল টকটকে ঠোঁট, যেন এইমাত্র রক্ত খেয়ে এল। লম্বা, সাদা, কোঁকড়ানো চুল টেনে পেছনে নিয়ে গিয়ে কালো ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। বেরিয়ে আছে বিশাল কপাল। পরনের সব কিছুই কালো। এমনকি গলাবন্ধ গরম জাম্পারটাও কালো।

মোমের মত সাদা একটা হাত তুলে গালে ঠেকিয়ে ভালমত দেখতে লাগল দুজনকে। 'ভাঁড় সেজেছ, না? সাজা তো উচিত ছিল মায়ানেকড়ে, কিংবা গোরস্থানের ভূত। মায়ানেকড়ে হলেই মানাত ভাল। জানো না,

হ্যালোউইনের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালে চাঁদের অসুখে ধরে?'

'চাঁ-চাঁ-চাঁদের অসুখ! সেটা আবার কি?'

'সেটা? চাঁদের দিকে তাকালে নেকড়ে-মানব হয়ে যায় লোকে।'

ফিরে তাকাল টেরি। সিঁড়ি থেকে নেমে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে টাকি।

'আরে, টাকি, যাচ্ছ কোথায়? এসো!' ডাক দিল টেরি।

থেমে গেল টাকি। কিন্তু এগোল না।

মিসেস জোরোবেলের দিকে ফিরল টেরি, 'আমি রবি।' টাকিকে দেখাল, 'আর ও, বব।' এইমাত্র যে টাকির নাম ধরে ডেকে ফেলেছে, খেয়ালেই নেই।

হেসে উঠল মিসেস জোরোবেল। গালে হাতটা চেপে রেখে হাসিমুখে বলল, 'হ্যালোউইনের রাত খুব পছন্দ আমার। সবচেয়ে প্রিয় ছুটির দিন।'

এতটা ভাল ব্যবহার পাবে, আশা করেনি টেরি। অবাক হলো। তারমানে ওদের চিনতে পারেনি মিসেস জোরোবেল।

ট্রীট ব্যাগটা তুলে ধরল টেরি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিসেস জোরোবেল। হাত বাড়িয়ে টেরির টুপিতে আটকে থাকা একটা পাতা টান দিয়ে ফেলে দিল। ব্যাগটার দিকে তাকাল আবার। 'বাহ্, অনেক জিনিস পেয়েছ তো!' টকটকে লাল ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ল হাসি। 'দেখি, আমি কি দিতে পারি।'

ঘুরে ভেতরে চলে গেল মিসেস জোরোবেল।

টাকির দিকে ফিরে তাকাল টেরি, 'কি, বলেছিলাম না, হ্যালোউইনের রাতে খারাপ ব্যবহার করবে না?'

উঠে এল টাকি। তবে ভয় এখনও যায়নি পুরোপুরি। চাপা গলায় বলল, 'কি চালাকি করবে, কে জানে!'

মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল মিসেস জোরোবেল। হাসিটা একই রকম আছে। 'নাও, রবি, তুমি নাও।' কাগজে মোড়া দুটো ক্যান্ডি টেরির হাতে তুলে দিল সে। 'তুমি আবার দাঁড়িয়ে আছো কেন ওখানে, টাকি? এসো, নাও।'

তাড়াতাড়ি বলল টেরি, 'ও টাকি না, বব।'

'ও, হ্যাঁ, বব। নাও।'

টাকির হাতেও একই রকম দুটো ক্যান্ডি ধরিয়ে দিয়ে মহিলা বলল, 'হ্যাপি হ্যালোউইন! তোমাদের পোশাক আমার পছন্দ হয়েছে। ভাল মানিয়েছে ভাঁড়ের পোশাকে। সত্যিকারের ভাঁড় সাজলে আরও ভাল লাগবে।'

ঘরে ঢুকে আস্তে করে দরজা লাগিয়ে দিল মিসেস জোরোবেল। তালা লাগানোর শব্দ হলো। নিভে গেল হলওয়ের আলো।

'দেখলে তো?' সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে টেরি বলল, 'ডাইনী-টাইনী কিছু না। কোন রকম খারাপ আচরণও করল না।'

'হ্যাঁ, দেখলাম। কল্পনাই করিনি এত ভাল ব্যবহার করবে। যাকগে, বাড়ি চলো এখন। আমার খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেলে ক্যান্ডি খেয়ে নিলেই হয়,' খোয়া বিছানো পথে নেমে এল টেরি। 'পপ কর্নও খেতে পারো। এত সকালে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার। ট্যাটনা শার্লকের দল কি করছে, দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'ওরা আর কি করবে,' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল টাকি। 'আমাদের মতই ক্যান্ডি কুড়াচ্ছে হয়তো।'

মিসেস জোরোবেলের দেয়া ক্যান্ডিগুলো বেশ ভারী। অনুমানেই ভাল মনে হলো টেরির। একটা ক্যান্ডি ব্যাগে রেখে দিয়ে অন্যটার মোড়ক খুলে কামড় বসাল। এক কামড়ে কেটে নিল অর্ধেকটা।

দেখাদেখি টাকিও তাই করল। চকোলেট মেশানো ক্যান্ডি। একবার চিবিয়েই বলে উঠল, 'দারুণ জিনিস দিয়েছে তো! খুব টেস্ট! মাত্র দুটো দিল? গোটা ছয়েক দিলে ভাল হত।'

'যা পেয়েছ, খাও। তুমি তো আসতেই চাইছিলে না।'

'কি ক্যান্ডি, দেখি তো। পরে কিনে খাবো।'

চাঁদের গায়ে মেঘ। আলো কমে গেছে। তবে মোড়কের লেখা পড়া যায়। 'বেস্ট বার,' টেরিকে জানাল সে। 'আসলেই বেস্ট, ঠিক নামই দিয়েছে কোম্পানি।' ক্যান্ডি থেকে কাগজটা পুরো খুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তার পাশে।

মিসেস জোরোবেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগের রাস্তাটা ধরেই ফিরে চলল ওরা। একটা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দেখল হই-চই করছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। উপহার নিতে এসেছে।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে টেরি বলল, 'টাকি, ক্যান্ডিটা যখন এতই পছন্দ হয়েছে তোমার, বদলাবদলি করতে পারি। দুটোর বিনিময়ে একটা।'

'কি দেবে তুমি?'

'ক্রাঞ্চ বার।'

'হবে না। একটার বদলে একটা।'

'থাকগে, একটা দিয়ে বদলানোর দরকার নেই। আমারটা আমিই খাব।'

রাস্তার মোড় ঘুরেই তিন গোয়েন্দাকে দেখতে পেল। বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘের

টুকরোটা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

থমকে দাঁড়াল টেরি।

মনে পড়ে গেল মিসেস জোরোবেলের কথা।

হ্যালোউইনের রাত আজ। পূর্ণিমা।

'চাঁদের অসুখ!' বিড়বিড় করল সে।

ক্যান্ডিটা শেষ করে ব্যাগ থেকে ক্যান্ডি কর্নের ব্যাগটা বের করল টাকি। দাঁতে কেটে কোনা ছিঁড়ে ঝরঝর করে মুখের মধ্যে ফেলল। চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

'চাঁদের অসুখ!' শয়তানি হাসি ফুটল টেরির মুখে। 'আমি শিওর, ট্যাটনা শার্লকগুলো সেটাই পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। আর দেখো না, বইখেকোটা তো নেকড়ে-মানব সেজে বসেই আছে। হি-হি-হি!'

'চলো, গিয়ে জিজ্ঞেস করি,' টাকি বলল।

'না, গিয়ে কাজ নেই। ওরা কোন কথা স্বীকার করবে না। বরং ইয়ার্কি মারবে আমাদের। তারচেয়ে নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখি কি ঘটে!'

রাস্তার পাশে সরে এল টেরি। হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। টান দিয়ে মুখোশটা খুলে রাখল ব্যাগের পাশে।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' জোরে জোরে কর্ন চিবাতে লাগল টাকি। 'আমি তাকাব না।'

'চুপ! আস্তে! ওদের কানে গেলে বুঝে যাবে তুমি ভয় পেয়েছ।'

'বুঝলে বুঝুক। আমি তাকাচ্ছি না।' অধৈর্য কণ্ঠে টাকি বলল, 'আচ্ছা টেরি, কিশোররা যা করে, সেটাই করার জন্যে পাগল হয়ে যাও কেন তুমি?'

'মজা পাওয়ার জন্যে। যাই বলো না কেন, ট্যাটনা শার্লকটার বুদ্ধি আছে। সব সময় কিছু না কিছু নিয়ে মেতে থাকে।'

চুপ করে চিবাতে থাকল টাকি।

চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল টেরি। মেঘটা সরে গেছে। বেরিয়ে এসেছে আবার ঝকঝকে চাঁদ।

চাঁদের দিকে মিনিটখানেক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল তিন গোয়েন্দা। হাঁটতে শুরু করল। উল্টো দিকে। ক্রমশ সরে যেতে লাগল টেরিদের কাছ থেকে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে টেরি বলল, 'তাকাচ্ছ না?'

'না,' জবাব দিল টাকি।

'ভয় লাগছে? তারমানে ডাইনী-বুড়ির কথা তুমি বিশ্বাস করেছ?'

'না, করিনি। আর করিনি বলেই তাকাচ্ছি না। ওসব কথা আগেই শুনেছি আমি। সব গাঁজা। ইনডিয়ানরা গুল মারে।...তাকানো তো হলো অনেকক্ষণ। ট্যাটনারাও চলে গেল। চলো এবার, বাড়ি যাই।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল টেরি। 'আজ আমি দেখে ছাড়ব, সত্যি সত্যি খারাপ কিছু ঘটে কিনা। না ঘটলে গুজবটাকে পুঁজি করে ঠকানোর চেষ্টা করব তোতলা মুসাটাকে। ওরা যে ভাবে ঠকিয়েছে আমাকে, আমি ভুলতে পারছি না। শোধটা নিতেই হবে।'

'কিভাবে নেবে?'

'সে দেখা যাবে। আগের কাজ আগে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টাকি। 'কি করতে বলো আমাকে?'

'একটু দাঁড়াও। ভালমত তাকিয়ে নিই।'

'স্রেফ বোকামি করছ। না তাকিয়েও বলে দেয়া যায়, কিচ্ছু হবে না।'

'তাহলে তাকাতে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

'কই পাচ্ছি?'

'ঠিক আছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমি পরখ করে নিই।'

'কয় মিনিট?'

'এই, পাঁচ-সাত মিনিট।'

সরাসরি চাঁদের দিকে তাকাল টেরি। তাকিয়েই রইল।

খাওয়া শেষ করে ক্যান্ডি কর্নের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল টাকি। চাঁদের দিকে তাকাল। নেকড়ে-মানব হয় কিনা দেখার কোন ইচ্ছে নেই তার। দেখছে, তার কারণ দেখতে ভাল লাগছে ভরাট চাঁদটা। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। শূন্যে ভেসে থেকে ছুটছে যেন। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

কথা বলছে না কেউ। নড়ছে না।

এক মিনিট...দুই...তিন...

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল টেরির দেহ। মনে হলো চাঁদের ওই সাদা আলো জীবন্ত কিছুর মত ঢুকে পড়ল তার ধমনীতে।

চার

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে টেরি।

ইলেকট্রিক শকের মত।

জড়িয়ে ফেলল যেন তাকে সাদা আলো।

এত উজ্জ্বল! চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছে না। নড়তে পারছে না।

আলোর চাদরের ওপাশে টাকির তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল।

ওকে ডাকার জন্যে মুখ খুলল টেরি। শব্দ বের করতে পারল না।

ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসতে লাগল আলো।

দরদর করে ঘামছে সে। টপ টপ করে শীতল ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মুখ থেকে। ভিজে গিয়ে পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেছে শার্ট।

ক্ষণিকের জন্যে সব আলো নিভে গেল চোখের সামনে থেকে।

আবার দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করল বাড়িঘর, রাস্তা, গাছপালা।

থরথর করে কাঁপছে সে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। মাথা থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ে ঘাড়ের কাছে শিরশিরানি তুলছে।

'টাকি…!' অনেক কষ্টে চিৎকারটা বের করল গলা দিয়ে।

অসুস্থ বোধ করতে লাগল।

বড় বড় নখওয়ালা একটা অদৃশ্য থাবা খামচি দিয়ে ধরেছে যেন পেটের মধ্যে। চাপ দিতে আরম্ভ করল। এত জোরে, দম নিতে পারছে না টেরি।

'মা-গো, মরে গেলাম…' ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু। 'আমি আর বাঁচব না…'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। পড়ে যাচ্ছে।

দুলে উঠল মাটি। গর্জন তুলে ছুটে আসতে লাগল যেন তাকে গ্রাস করার জন্যে।

শক্ত, কংক্রীটের রাস্তায় ঠুকে গেল কপাল।

তারপর সব অন্ধকার।

*

চোখের পাতা মিটমিট করল টেরি। একবার। দু'বার।

জেগে উঠল সে।

মাথা সোজা করার চেষ্টা করল। চোখের পাতা খুলল। চোখ মিটমিট করল উজ্জ্বল আলোতে।

সূর্যের আলো!

কোথায় রয়েছে সে?

চিৎ হয়ে আছে। জানালার দিকে তাকিয়ে। গাঢ় রঙের পর্দার অনেকখানি করে দুই পাশে টেনে দেয়া। কাঁচে প্রতিফলিত হচ্ছে কমলা রোদ।

সকালের রোদ।

পেশিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল সে। নড়ানোর চেষ্টা করল। দুই হাত মাথার ওপর টানটান করে দিল। বাড়ি লাগল খাটের তক্তায়।

বিছানায় রয়েছে।

নিজের বিছানায়। বাড়িতে।

সকাল হয়ে গেছে। নিজের বিছানায় নিরাপদে শুয়ে আছে সে। কোন সমস্যা নেই।

বাড়ি ফিরল কখন? মনে করতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটাই কি স্বপ্ন

ছিল?

ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!

চমৎকার সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। হাসতে ইচ্ছে করছে। অট্টহাসি। আনন্দে ফেটে পড়তে মন চাইছে।

সবই ছিল দুঃস্বপ্ন!

জোরে দম নিতে নিতে উঠে বসতে গেল সে।

চোখ পড়ল বিছানার চাদরের দিকে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গেল। ফাঁক হলো বটে মুখ, কিন্তু শব্দ বেরোল না।

পাঁচ

চাদর! বালিশ! চিরে ফালাফালা!

নখের আঁচড়ে ছিঁড়েছে ওরকম ভাবে।

চিৎকার করে উঠল সে। খসখসে শব্দ বেরোল গলা থেকে।

কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল সে। তাকিয়ে রইল ছেঁড়া চাদর আর বালিশের দিকে।

বালিশের খোলে কি লেগে আছে ওগুলো?

কালো, খাটো খাটো চুল। লোম!

কালো লোমে বালিশের কাপড় ছেয়ে আছে। চাদরে লোম ভর্তি।

হলো কি বিছানাটায়?

কি ঘটল? কোন দানব ঘুমিয়েছিল নাকি!

নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। কাঁপা কাঁপা, সর্দি লাগার মত শব্দ।

রোদের আলো চোখে লাগছে খুব। চোখ মিটমিট করল সে। আতঙ্কিত। চোখের পাতা কাঁপতে লাগল বিছানার দিকে তাকিয়ে।

সব যেন গোলমেলে। গণ্ডগোল হয়ে আছে সব কিছুতে।

কি ঘটেছিল?

হালকা নীল কার্পেটে ধুলোমাখা বড় বড় পায়ের ছাপ। এগিয়ে গেছে দরজা থেকে বিছানা পর্যন্ত।

জন্তুর পায়ের ছাপ।

আবার কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে উঠল সে। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। খসখস শব্দে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে হাঁ করা মুখ থেকে। দেয়ালে লাগানো আয়নার দিকে এগোল টলতে টলতে।

আতঙ্কিত হয়ে তাকাল আয়নার ভেতরে।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল ভয়াবহ এক দানবের দিকে।

মাথার চুল আগের মতই আছে। কিন্তু তার নিচে গজিয়েছে নেকড়ের মত লম্বা এক মুখ। কালো চকচকে নাক। চোয়াল ফাঁক করতেই বেরিয়ে পড়ল দুই সারি হলদেটে দাঁত। জানোয়ারের দাঁত।

হাত উঁচু করল। বাহু দুটো মানুষের মতই আছে। হাতের থাবাও মানুষের মত। তবে পেছন দিকটা লোমে ভরা। খাড়া খাড়া কালো লোম।

ঘাড়ের পেছনটাও ছেয়ে গেছে একই রকম লোমে। পিঠে লোম।

চোখ দুটোতে কেবল তেমন কোন পরিবর্তন নেই। আগের মতই আছে। তবে টকটকে লাল হয়ে আছে সারারাত না ঘুমানো মানুষের মত।

বাকি সব কিছু দানবীয়, কুৎসিত।

চাঁদের অসুখ!

সত্যি। সব সত্যি।

মিথ্যে বলেনি ডাইনী বুড়িটা।

চাঁদের অসুখে ধরেছে ওকে। বুঝতে পারছে টেরি।

হ্যালোউইনের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। সাদা জ্যোৎস্না স্রোতের মত বয়ে গিয়েছিল ওর দেহের ওপর দিয়ে। ধরবেই তো অসুখে।

টাকি?

টাকিকেও কি ধরেছে?

কাল রাতে এ বাড়িতেই তার থাকার কথা। টেরিদের বাড়িতে। টাকির বাবা-মা দীর্ঘদিনের জন্যে ইয়োরোপ চলে গেছেন। কাজেই নিরালা, একলা বাড়িতে ফেরার কোন তাগাদা নেই টাকির।

টেরির বাবাও বাড়ি নেই। ইটালি গেছেন। ব্যবসার কাজে। মা তো বহু আগেই ওর বাবাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

জানোয়ারের মত গোঁ গোঁ করে উঠল আবার টেরি। নাকের ফুটো দিয়ে সর্দি ঝরছে। পেটে জানোয়ারের খিদে। জানোয়ারের মতই ঝটকা দিয়ে দুলে দুলে সরে এল আয়নার কাছ থেকে।

দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়েই আছে, তবে স্বাভাবিক মানুষের মত সোজা হতে পারছে না। পিঠ সামান্য কুঁজো। খাটের কিনার দিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁকা হাঁটু বাড়ি লাগল খাটের মশারি স্ট্যান্ডের সঙ্গে। রাগে গর্জন করে উঠল জানোয়ারের মত।

পড়ে যাচ্ছিল। বিছানার কিনার খামচে ধরল। নখ লেগে চিরে ফালাফালা হলো বিছানা।

নবে মোচড় দিয়ে দরজা খোলার সময় আঁচড় লাগল কাঠের পাল্লায়। দুলতে দুলতে হলঘরে বেরোল সে।

গোঁ গোঁ করছে। হাঁপাচ্ছে।

কট্ কট্ করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে। নতুন চোয়ালে অভ্যস্ত হতে পারেনি এখনও। হলের মেঝেতে বিছানো কার্পেটে ঘষা লাগছে পায়ের নখ। থপ্ থপ্ শব্দ হচ্ছে পা ফেলার সময়।

এক হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে চলল সে। নখ লেগে কেটে যাচ্ছে দেয়ালের কাগজ।

গেস্টরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। টাকির যেখানে থাকার কথা।

ওকেও কি ধরেছে অসুখটায়? চাঁদের অসুখে?

রোমশ একটা হাত উঁচু করল সে। থাবা দিল দরজায়।

ছয়

জবাব না পেয়ে আরও জোরে থাবা মারল টেরি। মড়মড় করে উঠল দরজার কাঠ।

হাতের দিকে তাকাল। কুৎসিত, লোমে ঢাকা হাতে জানোয়ারের শক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

টাকি! টাকি! বলে ডাকার চেষ্টা করল টেরি। কিন্তু স্পষ্ট হলো না উচ্চারণ। কেমন একটা অং-অং শব্দ মিশে যাচ্ছে মুখ দিয়ে বেরোনোর সময়।

ভেতর থেকে সাড়া দিল টাকি। তার উচ্চারণেও অং-অং মেশানো।

সর্বনাশ!

চোখ বুজে এল টেরির। ওকেও ধরেছে! টাকিও চাঁদের অসুখে আক্রান্ত হয়েছে!

'দরজা খোলো! ভেতরে ঢুকব!' টেরি বলতে চাইল। কিন্তু জানোয়ারের জিভ তার এখন, ভারী হয়ে গেছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। লম্বা চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। কথা স্পষ্ট হচ্ছে না আরও সেজন্যে। এই মুখ নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। 'আমাকে ঢুকতে দাও!'

তবু দরজা খুলল না টাকি।

'যাও! যাও!' কানে এল জানোয়ারের মত চিৎকার। ব্যথা-ভরা আর্তনাদ।

'না, আমি যাব না!' গুঙিয়ে উঠল টেরি।

লোমে ঢাকা মুঠো তুলে ক্রমাগত কিল মারতে থাকল টেরি। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। এমন সহজে ভেঙে গেল কাঠের দরজাটা, যেন মলাটের তৈরি। বিশাল পা দিয়ে লাথি মেরে ভাঙা কাঠ সরিয়ে ভেতরে

ঢুকল সে।

আয়নার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টাকি। ফিরে তাকাল টেরির দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টি। কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে। সমস্ত শরীরেই পরিবর্তন ঘটেছে, কেবল চোখ দুটো বাদে।

লোমশ ভয়ানক বাহু দুটো মাথার ওপর তুলে ঝাঁকি মারল টাকি। গর্জন করে উঠল রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে।

আরেকবার গর্জে উঠে ঝাঁপ দিল টেরিকে লক্ষ্য করে। উড়ে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। দুই হাতে ঘুসি মারতে লাগল টেরির বুকে।

'তোমার দোষ! সব তোমার দোষ!' আধা-দুর্বোধ্য উচ্চারণে বার বার একটা কথাই বলছে টাকি।

মনে মনে নিজের দোষ মেনে নিতে বাধ্য হলো টেরি। তার গোয়াতুর্মিতেই এই অঘটনটা ঘটল। কিন্তু কি করে জানবে, ডাইনী বুড়িটা ঠিক কথাই বলেছিল? কি করে বুঝবে, 'চাঁদের অসুখ' বলে সত্যি সত্যি একটা অসুখ আছে? নিজেদের হয়েছে। তাই এখন বুঝতে পারছে।

ধাক্কা দিয়ে টেরিকে মাটিতে ফেলে দিল টাকি। বুকের ওপর চেপে বসে কিল-ঘুসি মেরে চলল সমানে। জন্তুর মত গরগর করছে। দাঁত কিড়মিড় করছে।

ঠেলে ওকে বুকের ওপর থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল টেরি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টাকি। টেনে তুলল টেরিকে। ঠেলে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলল দেয়ালের গায়ে।

চিৎকার করে উঠল টেরি। রাগ হয়ে গেল তারও। ঝাড়া মেরে টাকির হাত ছুটিয়ে নিয়ে সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি, মারামারি। পুরো বুনো জানোয়ারের মত।

ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল বিছানার পাশের টেবিলটা। ধড়াস করে বিকট আওয়াজ হলো।

প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে গিয়ে যুদ্ধ-বিরতি দিল দুজনে।

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেরি। দুই থাবা হাঁটুতে রেখে ভর দিয়ে। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

টাকিও হাঁপাচ্ছে। কোনমতে বলল, 'কি করব!'

তাই তো! কি করবে? এতক্ষণে ভাবল টেরি। কি করবে ওরা?

মাথা নাড়ল সে। জানে না।

'জোয়ালিন!' উত্তেজিত হয়ে বলতে গিয়ে গর্জন বেরিয়ে এল টাকির মুখ থেকে।

ঠিক। টেরিদের বাড়িতে কাজ করে জোয়ালিন। ঘর দেখাশোনা, রান্নাবান্না, সব। তাকে বোঝাতে হবে, ওদের অসুখ করেছে। এ ছাড়া আর

করবেই বা কি?

যে কোনভাবেই হোক, বোঝাতেই হবে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে ওরা নেকড়ে-মানব হয়ে গেছে।

ভাল হতে হলে তৃতীয় কারও সাহায্য লাগবে এখন।

দরজার দিকে রওনা দিল টেরি। পিছু নিল টাকি। ভাঙা দরজার কাঠ মাড়িয়ে বেরিয়ে এল হলে।

শিম্পাঞ্জির মত কুঁজো হয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে শুরু করল দুজনে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। দম নেয়ার শব্দ হচ্ছে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত।

দানবীয় শরীর দুটোকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল ওরা।

'জোয়ালিন!' চিৎকার করে ডাকল টেরি।

দরজার দিকে পেছন করে রান্নাঘরের সিংকে কাজ করছে জোয়ালিন। আবার ডাকল টেরি, 'জোয়ালিন!'

সাত

উদ্ভট কণ্ঠ শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল জোয়ালিন।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ।

হাত থেকে খসে পড়ে গেল কফির কাপ। যেটা ধুচ্ছিল। ঝনাৎ করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভেতরে ছিল বাদামী পানি, ছড়িয়ে পড়ল পায়ের কাছে।

'তো-তো-তোমরা কে!' ভয়ে তোতলানো শুরু হয়ে গেল জোয়ালিনের।

'জোয়ালিন···আমি!' বোঝানোর চেষ্টা করল টেরি। রোমশ হাতটা সামনে বাড়িয়ে নাড়তে গেল মানুষের মত, কিন্তু বন্য আচরণ শুরু করল ওটা। জিভটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে কথা বলতে গিয়ে, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসছে ফুসফুস থেকে। এ এক ভয়ানক পরিস্থিতি। কথাগুলো শোনাচ্ছে খসখসে।

আচমকা সংবিত ফিরে পেল জোয়ালিন। আতঙ্কে সে-ও প্রায় জানোয়ারের মতই চিৎকার করে উঠল, 'ভাগো! ভাগো!' থরথর করে কেঁপে উঠল দেহ। 'ভূত-প্রেত-দানব যা-ই হও তোমরা, দয়া করে যাও এখান থেকে!'

কাউন্টারের দিকে পিছিয়ে গেল সে। আচমকা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ঝুল ঝাড়ার ঝাড়ু। টেরি আর টাকির দিকে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, 'বেরোও! জলদি

বেরোও!'

বেরোচ্ছে না দেখে চেঁচাতে শুরু করল, 'ভূত! ভূত! দানব! কে আছো! বাঁচাও!'

'জোয়ালিন!'

বোঝানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল টেরি। ওরা ভূত নয়, টেরি আর টাকি, বোঝাতেই হবে। বলতে হবে চাঁদের দিকে তাকানোতেই তাদের এই অবস্থা।

'ভয় পাচ্ছ কেন, জোয়ালিন! আমরাই তো···আমি টেরি। ও টাকি!' বলতে চাইল টেরি। 'ভয় পেয়ো না। আমরা দৈত্যও নই, বুনো জানোয়ারও নই। আমাদের সাহায্য করো তুমি।'

কিন্তু এত কথা বেরোল না টেরির মুখ থেকে। যা বলতে পারল, তাতে চিৎকার আরও বেড়ে গেল জোয়ালিনের। কানে লাগছে টেরির। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঝাড়ু ঘুরিয়ে বাড়ি মারল জোয়ালিন। ডাণ্ডাটা লাগল টেরির পেটে।

গার্‌র্‌র্! গার্‌র্‌র্! ভয়ানক রাগে গর্জন বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে।

ঝাড়ুর ডাণ্ডাটা দুই হাতে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল জোয়ালিনের হাত থেকে। হাঁটুতে বাড়ি মেরে দুই টুকরো করে ফেলল।

টাকি গিয়ে থাবা মেরে ফেলে দিতে লাগল টেবিলে রাখা বাসন-প্লেট, কাপ-পিরিচ। মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙতে লাগল ওগুলো। গ্লাসগুলো এক এক করে তুলে নিয়ে দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সে।

রাগ দমন করতে পারছে না দুজনের কেউই। বুঝতে পারছে সেটা টেরি।

পুরোপুরি জন্তুতে পরিণত হয়েছে।

চিৎকার বন্ধ করল জোয়ালিন। হাঁ করে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। কাঁপছে। কাউন্টারের কিনার চেপে ধরেছে দু'হাতে। আতঙ্কে ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল।

'প্লীজ···' জোরে বলার সাহস পাচ্ছে না আর জোয়ালিন।

একটা কাঁচের কেবিনেটে ঘুসি মারল টাকি। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ।

'জোয়ালিন! আমাদের সাহায্য করো!' চিৎকার করে বলতে চাইল টেরি। 'নিজেদের আমরা সামলাতে পারছি না। জিনিস ভাঙতে চাই না আমরা। কিন্তু কোনমতেই ঠেকাতে পারছি না নিজেকে।'

কিন্তু এ সব কোন কথাই বলতে পারল না সে। বরং ভয়ানক আরেকটা গর্জন বেরিয়ে এল লম্বা মুখের ভেতর থেকে।

কাউন্টারের ধার ধরে সরে যেতে শুরু করল জোয়ালিন। 'প্লীজ···'

বিড়বিড় করে অনুরোধ করছে, ‘প্লীজ! চলে যাও!’

দেয়াল থেকে ছোঁ মেরে খুলে আনল রিসিভার। টিপে দিল তিনটে বোতাম।

‘পুলিশ!’ চিৎকার করে উঠল রিসিভার কানে ঠেকিয়ে। ‘পুলিশকে দিন! জলদি!’

প্রচণ্ড রাগ টগবগ করে ফুটে উঠতে লাগল টেরির মধ্যে। লাফাতে লাফাতে ছুটল। রাগে অন্ধ লাল চোখে সব কিছুই ধোঁয়াটে দেখছে এখন।

জোয়ালিনের হাত থেকে টান মেরে কেড়ে নিল রিসিভারটা। হ্যাঁচকা টানে দেয়াল থেকে তারসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে এল।

চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেল জোয়ালিন।

রিসিভারটা দেয়ালে আছড়ে ফেলল টেরি।

নিয়ন্ত্রণহীন। নিজের ওপর একেবারে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে।

শুধুই রাগ। প্রচণ্ড রাগ শক্ত করে দিয়েছে মাংসপেশিকে, দাঁত কিড়মিড় করাচ্ছে, গলা দিয়ে বের করে আনছে চাপা গর্জন।

রাগই এখন তার মগজকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। চাপা শিসের মত শব্দ করে বাতাস বেরোচ্ছে নাক দিয়ে।

রেফ্রিজারেটরের ডালা খুলে ফেলেছে টাকি। টান মেরে পাল্লাটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

পালাতে হবে এখান থেকে, বুঝতে পারছে টেরি।

এ ভাবে রান্নাঘরটা ধ্বংস করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া যে আচরণ করছে ওরা, সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। জোয়ালিনকেও জখম করে বসতে পারে।

সে রকম কিছু ঘটতে দেয়া ঠিক হবে না।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল টেরি। সামনে যা পড়ছে, তাতেই হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। রেফ্রিজারেটরের কাছ থেকে টাকির হাত ধরে টান দিল।

রাগ করে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল টাকি। সন্দিহান চোখে তাকাল।

জোর করে তাকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল টেরি।

কয়েক সেকেন্ড পরেই পেছনের আঙিনা ধরে ছুটল দুজনে। শরীর খুব ভারী লাগছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সামনে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে, দুই হাত ঝুলিয়ে মাটির ওপর দিয়ে প্রায় টেনে নিয়ে চলল নিজের দেহটা।

পেটে খিদের গর্জন। ভয়াবহ খিদে।

একটু আগেও রোদ ছিল। এখন মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে কালো

মেঘের দল। ওদের তপ্ত মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া।

দৌড়াতে ভাল লাগছে। পরিশ্রম ওদের রাগ কমাতে সাহায্য করছে।

গোঁ গোঁ, গর্গর্ করতে করতে পাশাপাশি ছুটল ওরা। মানুষের নজরের আড়ালে থাকতে চাইছে। সেজন্যে পাতাবাহারের বেড়ার ধার ঘেঁষে মাথা নুইয়ে চলেছে।

কোথায় যাবে? কি করবে?

কোন ধারণা নেই। স্পষ্ট ভাবে চিন্তা করতে পারছে না। কোন বুদ্ধি বের করতে পারছে না।

শরতের ঝরা পাতার কার্পেট বিছানো মাটিতে। সে-সব মাড়িয়ে, একটা ছোট ঝোপ ডিঙিয়ে, রাস্তা পার হয়ে চলে এল অন্য আরেকটা ব্লকে।

কয়েকটা বাড়ি পরে, রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে একদল ছেলেমেয়ে।

চট করে আড়ালে সরে গেল দুজনে। দেখতে পেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে ছেলেমেয়েগুলো।

কি করবে বুঝতে পারছে না ওরা। দুটো আধা-বুনো জন্তুর মত দৌড়ে পালাতে শুরু করল। মানুষ দেখলেই পালানো! কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!

সমস্যা আরও আছে। যতই দৌড়াচ্ছে, খিদে বাড়ছে। ভয়াবহ, রাক্ষুসে খিদে। মানুষ যখন ছিল, তখন এমন ছিল না।

পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। মোচড় দিচ্ছে। বার বার পেট খামচে ধরছে যেন তীব্র খিদে। খাবার ছাড়া আর কোন কথা ভাবতে পারছে না।

খেতে হবে। যে কোন ভাবেই হোক, খাবার জোগাড় করতে হবে।

নির্জন জায়গায় সরে এসে গতি কমিয়ে দিল টেরি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে লম্বা জিভ ঝুলে পড়েছে।

একটা গাছের গোড়ার দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি আটকে গেল তার। একজোড়া কাঠবিড়ালী।

দেখার পর একটা মুহূর্তও আর দেরি করল না। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুটো কাঠবিড়ালীর ওপর। মানুষ হয়ে যে কাজটা কোনমতেই করতে পারত না, সেটাই করে ফেলল অবলীলায়। দুই হাতের নখ দিয়ে চেপে ধরে ফেলল কাঠবিড়ালী দুটোকে। নিজেদের ক্ষিপ্রতা দেখে অবাক হলো।

ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল টাকি। দুজনে মিলে চোখের পলকে ছিঁড়ে ফেলল কাঠবিড়ালীটাকে। খেয়ে শেষ করে ফেলল। হাড়গুলোও চেটেপুটে ঝকঝকে করে ফেলল।

একটা অদ্ভুত দুঃখবোধ চেপে ধরল টেরিকে। জ্যান্ত কাঠবিড়ালী ছিঁড়ে কাঁচা মাংস খেয়েছে—যতই ভাবল কথাটা, দুঃখে জর্জরিত হতে থাকল মন।

পুরোপুরি জন্তুতে পরিণত হয়েছে দুজনে!

আট

কাঠবিড়ালী দুটোকে খাওয়ার পর ক্ষুধা সামান্য কমল। চিন্তা-ভাবনা শুরু করল আবার। কি করা যায়? কিভাবে রোগ সারাবে?

দুজনেই একমত হলো, অন্য কারও সাহায্য দরকার।

কার সাহায্য?

হ্যারল্ড। ওর বড় ভাই আছে। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে হাসপাতালে, বা চিকিৎসার জন্যে যেখানে যেতে চায়, সেখানে।

চিকিৎসাটা কোথায় হবে?

সেটা পরে ভাবা যাবে। হ্যারল্ড সাহায্য করতে রাজি হলে ওর বড় ভাইই পরামর্শ দিতে পারবে, কোথায় যাওয়া যায়।

কিন্তু হ্যারল্ড কি রাজি হবে? না হওয়ার কিছু নেই। হ্যারল্ড ওদের বন্ধু।

হ্যারল্ডদের বাড়ি ওখান থেকে কয়েক ব্লক দূরে। যাওয়ার সময় কার চোখে পড়ে যাবে, হট্টগোল শুরু হবে, ঠিক নেই। তবু যেতেই হবে।

গাছপালা, পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল দুজনে। চোরকাঁটা, শুকনো পাতা আটকে যাচ্ছে লোমের মধ্যে, কেয়ারই করছে না ওরা।

নিরাপদেই হ্যারল্ডদের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে দুজনে। খিদে টের পেল টেরি। আবার মোচড় দিতে শুরু করেছে পেট। পুরোপুরি ভরাতে ক'টা কাঠবিড়ালী লাগবে!

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। আপনাআপনি চাপা গর্জন বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে। হতাশার। কাজে যাচ্ছেন হ্যারল্ডের বাবা মিস্টার বাকসন। হ্যারল্ড বসে আছে গাড়িতে। তাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় চলে যাবেন মিস্টার বাকসন।

অল্পের জন্যে হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারল না ওরা।

'স্কুলে গিয়ে দেখা করব!' বিকৃত উচ্চারণে চিৎকার করে উঠল টেরি।

জোরে জোরে নেকড়ে-মাথাটা নাড়তে নাড়তে টাকি বলল, 'হবে না। ছেলেমেয়েরা দেখলে ভয় পাবে। চেঁচামেচি করে বিপদে ফেলে দেবে আমাদের।'

ঠিকই বলেছে টাকি। হতাশায়, রাগে পেটের মধ্যে আবার খামচি দিয়ে ধরতে আরম্ভ করল টেরির।

কি বিপদেই না পড়ল!

অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও স্বাভাবিক মানুষ ছিল ওরা। এখন পুরোপুরি দানব!

ইস্, কেন যে বোকামিটা করতে গেল! জিপসি বুড়ির কথা অবিশ্বাস করে চাঁদের দিকে তাকাল!

মনে পড়ল তিন গোয়েন্দার কথা। ওরাও তাকিয়েছিল চাঁদের দিকে। তবে কি ওরাও নেকড়ে-মানব হয়ে গেছে?

তুড়ি বাজাতে গেল টেরি। কিন্তু বড় বড় নখওয়ালা আঙুল দিয়ে বাজানো সম্ভব হলো না। উত্তেজিত হয়ে টাকির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিশোররাও তাকিয়েছিল!'

টাকিও উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ঠিক! ওদেরও নেকড়ে হয়ে যাওয়ার কথা। চলো, গিয়ে দেখি ওদের অবস্থা। ট্যাটনাটা নেকড়ে হলে আমাদের জন্যে সুবিধে। ভাল হওয়ার কোন না কোন ব্যবস্থা সে করেই ফেলবে।'

'কিন্তু আগে খাওয়া দরকার,' টেরি বলল। 'পেটের মধ্যে যে ভাবে মোচড় দিচ্ছে...'

কিন্তু কি খাবে?

ছোট একটা জংলামত জায়গায় এসে ঢুকল ওরা। ঝোপঝাড়ের নিচে মাটিতে আর ডালপালায় প্রচুর পোকা-মাকড় দেখতে পেল। মহানন্দে সেগুলোই খাওয়া শুরু করে দিল। মানুষ থাকাকালে যে জিনিস চোখে দেখলেও গা গোলাত, সেগুলোই হয়ে উঠল এখন সুস্বাদু খাবার।

পোকা-মাকড়, পাখির ডিম, এমনকি একটা বাসা থেকে সদ্য ফোটা পাখির ছানাও গোগ্রাসে গিলে ফেলল ওরা। পেট কিছুটা ঠাণ্ডা হতে রওনা হলো কিশোরদের বাড়ির দিকে।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। হ্যারল্ডদের পরের ব্লকের একটা বাড়ির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একজন লোকের সামনে পড়ে গেল। গ্যারেজের সামনে গাড়ি ধুচ্ছিল সে। যতই বোঝানোর চেষ্টা করল দুজনে, ওরা মানুষ, দানব নয়, কিছুতেই বুঝল না লোকটা। শেষে একটা শাবল তুলে নিয়ে বাড়ি মেরে বসল টাকিকে। বাড়িটা ঠিকমত লাগলে মাথা ফেটে যেত টাকির। লাগেনি, রক্ষা। বাধ্য হয়ে শেষে লোকটার হাতে কামড়ে দিল টেরি।

কামড় খেয়ে ছুটে পালাল লোকটা। বাড়ির ভিতর গিয়ে পুলিশকে ফোন করল।

ব্লকটা পেরোনোর আগেই পুলিশের সাইরেনের শব্দ কানে এল ওদের।

ঘিরে ফেলল পুলিশ। দেখে ফেলল দুজনকে। ধাওয়া করল।

তাড়া খেয়ে আর কোন উপায় না দেখে একটা ম্যানহোলে ঢুকে পড়ল দুজনে।

'শেষে নর্দমা!' রাগে, দুঃখে চিৎকার করে উঠল টেরি।

'চুপ!' সাবধান করল টাকি। ম্যানহোলের ঢাকনাটা নামিয়ে দিয়ে, বাঁচার জন্যে নর্দমার আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগল।

মাথার ওপরে ভারী বুট পরা পায়ের ছোটাছুটির শব্দ। হই-চই, চিৎকার, হট্টগোল।

ভয়াবহ দুর্গন্ধ ভেতরে!

আলোও নেই। গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু ওদের চোখের ক্ষমতা বেড়ে গেছে এখন। আসল নেকড়ের মত অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে।

কানে আসছে পানির ফোঁটা পড়ার শব্দ। বদ্ধ জায়গায় বিশ্রী, বিরক্তিকর লাগছে শব্দটা।

তবে এরই মাঝে উত্তেজক আরেকটা শব্দ কানে এল।

বড় ইঁদুরের তীক্ষ্ণ কিঁচকিঁচ।

ধমনীর রক্ত ঝলকে উঠল ওদের।

খাবার! লোভনীয় খাবার!

নয়

আশপাশটা দেখতে লাগল টেরি। পাকা ড্রেন। কংক্রীটের দেয়াল। নিচে ময়লা পানির তীব্র স্রোত।

'এখানে থাকতে মোটেও ভাল লাগছে না আমার!' রোমশ পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে বসে ঘোষণা করল টাকি।

মাথার ওপরে পুলিশের বাঁশি, চিৎকার-চেঁচামেচি চলছেই।

'উপায় নেই,' টেরি বলল। 'এখানেই থাকতে হবে আমাদের। স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত, হ্যারল্ড না আসা পর্যন্ত।'

'কিশোরদের বাড়ি যাবে না?'

'যাব। স্যালভিজ ইয়ার্ডটা তো অনেক দূর। যেতেই যখন পারলাম না, আগে হ্যারল্ডের সঙ্গেই কথা বলি।'

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে চলে গেল পুলিশ।

পেটের মধ্যে জ্বলে উঠছে আবার ক্ষুধার আগুন। নর্দমার মধ্যেই খাবারের খোঁজ করতে লাগল দুজনে।

নানা রকমের পোকা আর আরশোলার অভাব নেই। সেগুলোই ধরে ধরে খেতে শুরু করল। বেশির ভাগই বাজে স্বাদ। কিন্তু খিদের তাড়নায় ভালমন্দ বাছবিচারের মধ্যে গেল না।

নর্দমায় ভেসে যাওয়া ফুলে ওঠা একটা মরা ইঁদুর দেখে হাতে যেন চাঁদ

পেল টাকি। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে মুখে পুরে ফেলল।

করুণ দৃষ্টিতে টাকির দিকে তাকিয়ে টেরি বলল, 'এক্কেবারেই জন্তু হয়ে গেলাম আমরা! কি সব খাচ্ছি, দেখো!'

রাগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল টাকির মগজে। 'সব তোমার দোষ!'

নর্দমার মধ্যে আর ঝগড়াঝাঁটি বাধাতে চায় না টেরি। তাড়াতাড়ি বলল, 'চিন্তা নেই। হ্যারল্ড আমাদের সাহায্য করবে। একটা ব্যবস্থা সে করবেই।'

ওপরে, বাইরেটা এখন পুরোপুরি নীরব হয়ে গেছে।

নর্দমার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল দুজনে। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কালো রঙের ভয়াবহ নোংরা পানি। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে বিষাক্ত, পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে গিয়ে।

অপেক্ষা করে রইল ওরা।

সাড়ে তিনটার কিছু পরে আস্তে আস্তে এগোল ম্যানহোলটার দিকে। খুব সাবধানে ঠেলা দিয়ে ঢাকনা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল টেরি। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। আবার মেলল। ধীরে ধীরে চোখে সইয়ে নিল আলো। বিকেলের রোদ এসে পড়েছে ম্যানহোলের ওপর।

ঢাকনা তুলে উঠে এল দুজনে। লোকজন নেই আশেপাশে। বাতাস ঠাণ্ডা। গায়ে রোদের উত্তাপটা ভাল লাগছে ওদের।

লাথি মেরে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিল টেরি। নিজের শক্তি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। মানুষ থাকতে লোহার ঢাকনায় এ ভাবে লাথি মারলে নির্ঘাত গোড়ালি মচকাত।

গাছপালার আড়ালে আড়ালে রাস্তার মোড়ে চলে এল দুজনে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল। এ পথ দিয়েই যাবে হ্যারল্ড।

প্রথম গেল দুটো ছেলে-মেয়ে।

তারপর দল বেঁধে এল বাকিরা। তাদের মাঝে হ্যারল্ডকে দেখে দমে গেল টেরি আর টাকি। একা না পেলে কথা বলা যাবে না।

ফিসফিস করে টেরি বলল, 'হ্যারল্ডদের বাড়ির কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে।'

গাছপালা আর পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে থেকে আবার ছুটল দুজনে। হ্যারল্ডের আগেই ওদের বাড়ির কাছে পৌঁছতে হবে।

ওরা এখন জানোয়ার। মানুষের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে। হ্যারল্ড আসার অনেক আগে এসে বসে রইল ওদের বাড়ির সামনের লনের কিনারে, ঝোপের মধ্যে।

'এদিক দিয়ে যদি না আসে?' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল টাকি। বার বার বিফল হয়ে বেশি আশা করতে ভয় পাচ্ছে সে।

'এদিক দিয়েই আসবে,' টেরি বলল। 'সামনের গেট দিয়ে। পেছনে যাবার কোন কারণ নেই।'

'যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করে?'

'করাতে হবে।'

'চিনতে পারবে তো?'

'প্রথমে তো পারবেই না। আসুক। দেখা যাক। ও আমাদের বন্ধু। বুঝিয়ে বললে একটা ব্যবস্থা করবেই সে।'

'বলার সুযোগ দিলে, তবে তো। দেখেই যদি দৌড় মারে?'

'ওই যে, আসছে সে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল টেরি।

শিস দিতে দিতে হেলেদুলে হেঁটে আসছে হ্যারল্ড। একা। হাঁটার তালে তালে ঝাঁকি খাচ্ছে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ।

গেট দিয়ে ঢুকল হ্যারল্ড। এগিয়ে আসতে লাগল ড্রাইভওয়ে ধরে।

'হ্যারল্ড!' বলে বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল টাকি।

টেরিও বেরিয়ে এল।

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল যেন হ্যারল্ড।

আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেল মুখ।

বেল্ট থেকে ঢিল হয়ে গেল আঙুলগুলো। ব্যাগটা খসে পড়ে গেল কাঁধ থেকে।

'হ্যারল্ড!' আবার চিৎকার করে বলল টাকি। 'আরে, আমি! আমি টাকি। ও টেরি।'

এতক্ষণে চিৎকার বেরোল হ্যারল্ডের মুখ থেকে।

তারপর আচমকা পাশ কাটিয়ে দিল দৌড়।

যতই পেছন থেকে চিৎকার করে বোঝানোর চেষ্টা করল টেরি আর টাকি, শুনল না হ্যারল্ড। দাঁড়ালও না। সোজা বাড়িতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল।

আধ মিনিট পর বাড়ির ভেতর থেকে হই-চই শোনা গেল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা বন্দুকের নল। ধুড়ুম করে গুলির শব্দ হলো। শটগান দিয়ে ওদের গুলি করার চেষ্টা করছে হ্যারল্ডের ভাই।

ভাগ্য ভাল, ছররাগুলো লাগল না টেরি বা টাকির গায়ে।

আর দাঁড়াল না ওরা ওখানে। দৌড় দিল রাস্তার দিকে। গুলি খেয়ে মরতে চায় না।

কয়েক মিনিট পর আবার শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করা হয়েছে হ্যারল্ডদের বাড়ি থেকে।

হ্যারল্ডের ওপর মনটা বিষিয়ে গেল টেরির। হাতের কাছে পেলে এখন নখ দিয়ে ছিঁড়ত।

বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না। নিজেদের প্রাণ বাঁচানো জরুরী হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা আবার সেই ম্যানহোলের মধ্যে আত্মগোপন।

দশ

দুই দুই বার ফোন পেয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেছে পুলিশ। ওদের বাঁশি আর পদশব্দ থেকে থেকেই শোনা যেতে লাগল। বেরোনোর সুযোগ পাচ্ছে না টেরিরা।

মাঝরাতের পরে শব্দ থেমে গেল। তারপরেও বেরোল না ওরা। আরও সময় যাক।

ভোরের ঘণ্টাখানেক আগে সাবধানে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তার মোড়ে পুলিশ দেখতে পেল। তারমানে মোড়ে মোড়ে কড়া পাহারা বসিয়েছে। এ অবস্থায় স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাওয়াও নিরাপদ নয়। একটা জায়গার কথাই মনে পড়ল ওদের–মুসাদের বাড়ি। বনের কিনারে ওদের বাড়ি। ওদিকটায় বাড়িঘর বিশেষ নেই। পুলিশও অত দূর যাবে বলে মনে হয় না।

রাতের অন্ধকারে নিজেদের রোমশ শরীরটাকে আড়াল করে এগিয়ে চলল দুজনে।

রাস্তার পাশে লম্বা লম্বা ঘাস। সেগুলোর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে খুব সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগল। গাড়ি আসতে দেখলে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে টাকি বলল, 'যদি মুসাদের বাড়িতেও পুলিশ ডাকে?'

'এবার ডাকলে আর পালাব না,' হাল ছেড়ে দিয়েছে টেরি। 'ধরে নিয়ে যায়, যাক। আমরা তো আর কোন অপরাধ করিনি।'

'নিয়ে গিয়ে যদি চিড়িয়াখানায় ভরে রাখে? রাস্তাঘাটে কোন জানোয়ারকে ছাড়া দেখলে তাই তো করে ওরা।'

'কপালে যদি থাকে চিড়িয়াখানা, কি আর করব!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল টেরি। 'মানুষের আনন্দের খোরাক হব!'

একটা গাড়ি আসতে দেখে মাথা নামিয়ে ফেলল দুজনে। ওদের পাশ দিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল গাড়িটা।

পুলিশের গাড়ি নাকি!

'সর্বনাশ!' ঠাণ্ডা মাটিতে পেট ঠেকিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল টাকি। 'দেখে ফেলেছে আমাদের!'

'চুপ! কথা বোলো না!' লোমে ছাওয়া বুকের গভীরে ধড়াস ধড়াস বাড়ি মারছে টেরির হৃৎপিণ্ড।

তবে গাড়ি থেকে নামল না কেউ। কয়েকটা সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে

চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাথা তুলল টাকি। 'যাক বাবা, বাঁচা গেল!'

আবার হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়িটার ব্রেক কষার কারণ বুঝতে পারল।

বড় একটা খরগোশ মরে পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। চাকার চাপে ভর্তা হয়ে গেছে।

খিদে যেন লাফ দিয়ে উঠল দুজনের পেটে। দৌড়ে গিয়ে রক্তাক্ত খরগোশটা তুলে নিল টেরি। এখনও গরম।

টাকির দিকে তাকাল টেরি, 'খাবে?'

খাবে না মানে!

মরা খরগোশটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনে। দাঁত আর নখ দিয়ে ছিঁড়ে খেতে শুরু করল।

একটা খরগোশে কিছুই হলো না ওদের। ছ'টা দিলেও এখন সাবাড় করে ফেলবে, এত খিদে। এতক্ষণ অতটা খেয়াল ছিল না খাওয়ার কথা। পেটে খাবার পড়তেই শোরগোল শুরু করেছে পেট–আরও দাও! আরও দাও!

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার!' গুঙিয়ে উঠল টাকি। 'শেষ পর্যন্ত রাস্তার মড়া তুলেও খেলাম!'

আরও খাবার দরকার।

আশেপাশে তাকাতে লাগল টাকি। যেন রাস্তাটা মরা খরগোশে ভরে থাকলে ভাল হত।

কিন্তু আর কোন খাবার দেখতে পেল না।

উঠে দাঁড়াল টেরি। টাকিকে নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এসে ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

গাছপালায় আড়াল করা মুসাদের বাড়িটাতে যখন পৌঁছল দুজনে, ভোর প্রায় হয়ে গেছে। ভোরের শীতল শিশির বরফের মত ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে। শীতে কাঁপছে ওরা।

অন্ধকার এখনও কাটেনি। গাছপালার মধ্যে অন্ধকার বেশি। তাতে সুবিধেই হলো। নিরাপদে মুসাদের সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

লম্বা, চোখা নখ দিয়ে বেলপুশ টিপতে অসুবিধে হলো টেরির। দরজার থাবা মারতে শুরু করল।

জবাব নেই।

'শীতের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে সবাই,' আফসোস করে টাকি বলল। নিজের অজান্তেই ঘাড়ের লোম ধরে টান দিল। বেশি অস্বস্তি বোধ করলে এ রকম ·রে সে। জন্তু হয়েও অভ্যাসটা ভুলতে পারেনি।

'জাগাতে হবে,' টেরি বলল।

থাবা তুলে কিল মারতে শুরু করল দুজনে।

তাতেও সাড়া না পেয়ে শেষে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল টেরি। রাগত নেকড়ের চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল গাছপালার গায়ে।

আবার খানিকক্ষণ কিলাকিলি।

অবশেষে খুলল দরজা।

ঘুম জড়িত চোখে দরজা খুলে দিয়েছে মুসা। নীল-সাদা ডোরাকাটা ঢোলা পাজামা পরনে। খুলি আঁকড়ে থাকা কোঁকড়া কালো চুলগুলোকে বিচিত্র লাগছে পেছন থেকে এসে পড়া মৃদু আলোয়।

'খাইছে! ভূত! ভূত!' বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল সে।

তৈরিই ছিল টেরি। চট করে একটা পা ঠেলে দিল ভেতরে। বুকে ধাক্কা মেরে পেছনে সরিয়ে দিল মুসাকে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে ঢুকল টাকি। মুসাকে ধরে রাখল টেরি, যাতে দৌড়ে গিয়ে কাউকে খবর দিতে না পারে। টাকি লাগিয়ে দিল দরজাটা।

দুজনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে মুসাকে হলরুমে নিয়ে এল।

আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুসার। কথা সরছে না মুখে।

অভয় দিয়ে টেরি বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমরা। আমি টেরি। ও টাকি।'

এতক্ষণে খেয়াল করল টাকি, মুসা স্বাভাবিক মানুষই আছে। নেকড়ে-মানব হয়নি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নেকড়ে-মানব হওনি?'

মুসা আরও অবাক। তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করল, 'নে-নে-নেকড়ে! তা হব কেন?'

ইস্, মানুষ থাকা অবস্থায় যদি মুসাকে এ ভাবে ভয় দেখাতে পারত! আফসোস করল টেরি। এখন নিজেরাই বেসামাল। মজা পাওয়ার অবস্থা নেই।

'তোমার আব্বা-আম্মা কোথায়? ঘুমাচ্ছে?'

টেরির বিকৃত উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে মুসার। 'বা-বা-ব্বাড়ি নেই। আমি এ-একা!'

'ভালই হলো!' টাকি বলল। এতক্ষণে যেন ভাগ্য খুলতে আরম্ভ করেছে।

'কে-কে-ক্কেন?' মুসার তোতলামো যাচ্ছে না কোনমতে। 'আমাকে খে-খে-খেয়ে ফেলবে নাকি?'

'না, খাব না,' টেরি বলল, 'যদি আমাদের সব কথা মন দিয়ে শোনো।' টাকির দিকে তাকাল, 'চলো, ওই সোফাটায় বসা যাক।'

সোফায় বসল টেরি আর টাকি। মাঝখানে বসাল মুসাকে, যাতে

পালাতে না পারে।

'চাঁদের অসুখে ধরেছে আমাদেরকে, মুসা,' টেরি বলল। 'হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম।'

'তোমরাও তো তাকালে,' টাকি বলল। 'তোমাদের কিছু হলো না কেন? কিশোর আর রবিন কি তোমার মতই স্বাভাবিক আছে?'

'আমি স্বাভাবিক নেই!' জবাব দিল মুসা। 'ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছি!'

'না, দুঃস্বপ্ন নয়,' টেরি বলল। 'এটা বাস্তব। সত্যি সত্যি নেকড়ে-মানব হয়ে গেছি আমরা।'

'স্বপ্ন না হলে তো আরও খারাপ হলো আমার জন্যে,' মুসা বলল। 'ভুলভাল দেখছি। তারমানে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। আমি এখন বদ্ধ উন্মাদ!'

'তুমি উন্মাদও নও, কিছু নও, পুরোপুরি সুস্থ।'

'আগে কিছু খাবার দাও দেখি আমাদের,' টাকি বলল। 'খিদেয় পাগল হয়ে গেলাম! ফ্রিজে কিছু আছে? যা আছে, সব দরকার। রান্না হোক, কাঁচা হোক, যা আছে সব চাই।'

*

'কোন না কোন চিকিৎসা তো এর নিশ্চয় আছে,' জোর গলায় টেরি বলল। 'অসুখ যেহেতু, ভাল হওয়ার উপায় আছেই। সেটাই জানতে হবে আমাদের।'

গরগর করে উঠে টেরিকে সমর্থন করল টাকি।

মুসাদের ফ্রিজ খালি করে পেট ঠাণ্ডা করেছে দুজনে। সব কথা খুলে বলে মুসাকে বোঝাতেও পেরেছে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে সত্যি সত্যি ওরা নেকড়ে-মানব হয়ে গেছে। ইনডিয়ান গুজবটা মুসারও জানা, সেজন্যে টেরিদের কথা বিশ্বাস করেছে।

'কিন্তু কি চিকিৎসা...' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। আঙুল তুলল, 'দাঁড়াও, মনে পড়েছে। বোরিসভাই একটা গল্প বলেছিল...'

'বোরিসভাইটা কে?' জানতে চাইল টাকি।

'কেন, কিশোরদের কর্মচারী। চেনো না?'

'ও, ওই বোরিস–হোকে হোকে করে যে।'

OK-কে 'হোকে' বলে বোরিস, রকি বীচের যারা ওকে চেনে, সবাই জানে। কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন সে।

'হ্যাঁ, ওই বোরিস,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আল্পস পর্বতের এক বনে একবার ক্যাম্পিঙে গিয়ে নাকি মায়ানেকড়ের গুজব শুনেছিল।'

'মায়ানেকড়েটা কি জিনিস?' টাকির প্রশ্ন।

'এক জাতের ভূত।'

'কিন্তু আমরা তো ভূত নই। জ্যান্ত মানুষ। অদ্ভুত রোগের শিকার। নেকড়ে-মানব হয়ে গেছি।'

'ও-ই হলো। মায়ানেকড়েও যা, নেকড়ে-মানবও তাই!'

'আহ্, বাধা দিয়ো না তো!' টাকিকে ধমক দিল টেরি। 'ওকে বলতে দাও। তারপর?'

'বনের মধ্যে একটা নিরালা কুটিরে এক ইনডিয়ান মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোরিসভাইয়ের,' মুসা বলল। 'সেই মহিলা অনেক ভেষজ ওষুধের খোঁজ রাখে। নানা রকম উদ্ভট রোগ সারাতে পারে। নেকড়ে হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প সেই মহিলাই বলেছিল বোরিসভাইকে।'

'তাহলে সেই মহিলার কাছেই আমাদের যাওয়া উচিত!' চিৎকার করে উঠল টেরি।

'তার কাছে না গিয়েও ভাল হতে পারো তোমরা,' মুসা বলল।

'কি ভাবে!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল টেরি আর টাকি।

'হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালে মানুষ নেকড়ে-মানব হয়...'

'যেমন আমরা হয়েছি,' নিজের ওপর আক্রোশ জমেছে টাকির, তাকিয়েছিল বলে। 'কিন্তু তোমরা তিনজনও তো তাকিয়েছিলে। তোমরা হলে না কেন?'

'হয়তো সময়-ক্ষণ ঠিক ছিল না,' জবাব দিল মুসা। 'তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমরা যখন তাকিয়েছ ঠিক ওই সময়টাতে চন্দ্র-রোগের জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছিল চাঁদ।'

'তা হতে পারে,' একমত হলো টেরি। 'বলো, ইনডিয়ান মহিলার কাছে না গিয়ে কি ভাবে ভাল হতে পারি আমরা?'

'বোরিসভাই শুনে এসেছে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে নেকড়ে-মানব হয়ে গেলে পরের চাঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। পরের পূর্ণিমাতে তাকালে উল্টো ওষুধ ঢুকবে শরীরে। তাতে ভাল হয়ে যাবে তোমরা।'

'কিন্তু তার জন্যে তো আটাশ দিন অপেক্ষা করতে হবে,' চেঁচিয়ে উঠল টাকি। 'ততদিন বাঁচবই না আমরা...'

'তা অবশ্য ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'মহিলা নাকি বলেছে, ততদিন বাঁচে না কেউ। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেয়ে মারা যায় রোগী।'

'না না না! তাহলে দরকার নেই অপেক্ষা করার!' চিৎকার করে বলল টেরি।

'যা করার এখুনি করো!' টাকি বলল। 'তোমার পায়ে পড়ি, মুসা! আমাদের তুমি বাঁচাও! একটা কিছু ব্যবস্থা করো! কথা দিচ্ছি, জীবনে আর

শয়তানি করব না তোমাদের সঙ্গে।'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। তারপর বলল, 'আমি একা তো কিছু করতে পারব না। কিশোরের সাহায্য লাগবে। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'যা খুশি করো,' টেরি বলল। 'দরকার হয়, বোরিস-রবিন সবার সাহায্য নাও। কেবল আমাদের ভাল করার বন্দোবস্ত করো। চিরকাল তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আমরা।'

'বেশ, বসো তোমরা,' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'কোথায় যাচ্ছ?' শঙ্কিত হয়ে উঠল টাকি।

'ভয় নেই,' হাসল মুসা। 'কিশোরকে ফোন করব।'

'পুলিশকে খবর দেবে না তো?'

'তোমাদের মত কথার নড়চড় করি না আমরা, টাকি,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'বলেছি যখন সাহায্য করব, করবই। আমি কিশোরকেই ফোন করতে যাচ্ছি।'

এগারো

হ্যালোউইনের ছুটিতে এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেছেন মুসার বাবা-মা। টেরিদের সুবিধে হলো সেজন্যে। নিরাপদেই লুকিয়ে থাকতে পারল মুসাদের বাড়িতে। পুলিশ ওদের খোঁজ পেল না।

পুলিশ আর জোয়ালিন যে ওদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ খবর মুসার কাছেই জানতে পারল ওরা।

পরদিন সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় ওরা জানল, ওদের নিয়ে কি করতে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডের ঝরঝরে লক্কর ট্রাকটাতে তোলা হলো ওদের। গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টে আনল বোরিস।

সঙ্গে তিন গোয়েন্দা রয়েছে। নেমে গিয়ে ট্রাকের পেছন থেকে লম্বা দুটো ধূসর রঙের প্ল্যাস্টিকের বাক্স নামাতে বোরিসকে সাহায্য করল ওরা।

টেরি আর টাকিকে বলল কিশোর, 'কার্গো ক্যারিয়ারে করে যেতে হবে তোমাদের।' টান দিয়ে একটা বাক্সের ডালা তুলল সে। আরেকটা তুলল মুসা।

'যাও, ঢোকো,' কিশোর বলল। 'মালের সঙ্গে তুলে দেব।'

'কিন্তু...' বলতে গেল টেরি।

'যাত্রীদের সঙ্গে তোমরা যেতে পারবে না,' বোঝাল কিশোর। 'তোমাদের প্লেনেই উঠতে দেবে না। যেতে হলে কার্গো হোল্ডে করেই যেতে

হবে। এটাই একমাত্র উপায়।'

'দম নেব কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করল টাকি।

বাক্সের গায়ে ফুটোগুলো দেখাল কিশোর। 'বাতাস ঢোকার পথ, দেখছ না? শ্বাস নিতে অসুবিধে হবে না। জলদি করো। কেউ দেখে ফেললে...'

বাক্সে ঢোকা ছাড়া গতি নেই।

আর তর্ক করল না টাকি বা টেরি। কফিনে শোয়ার মত করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বাক্সের ভেতরে। ডালা নামিয়ে দেয়া হলো ওদের ওপর। তালা লাগিয়ে দিল বোরিস।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে টেরি। গর্জন করে উঠে ঘুসি মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে ডালাটা। জানোয়ারের মত বাক্সে তালাবদ্ধ হয়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

কয়েক মিনিট পর অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল দুজনের। বাক্স তোলা হলো মাটি থেকে। ফুটো দিয়ে টেরি দেখতে পেল, বিমানবন্দরের পোশাক পরা কয়েকজন লোক বাক্স দুটো ঠেলাগাড়িতে তুলে দিচ্ছে।

প্রথমে টেরির বাক্সটা গাড়িতে রাখল ওরা। ভেতরে মানুষ আছে সেটা তো আর জানে না, তাই সাবধানে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন বোধ করল না। আছড়ে ফেলল গাড়ির ওপর। ব্যথা লাগল পিঠে। আপনাআপনি চাপা শব্দ বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে। মনে হয় লোকগুলো শুনতে পায়নি। শুনলে অবাক হতো। খুলে দেখতে চাইত। টেরির বাক্সর ওপর টাকির বাক্সটা রাখল ওরা।

চলতে শুরু করল গাড়ি। এয়ারপোর্ট টার্মিনালের পেছনের রানওয়ে ধরে এগিয়ে চলল।

ফুটো দিয়ে বিরাট একটা জেটপ্লেনের খানিকটা দেখতে পেল টেরি। বিমানটার নাকের কাছে রাখা মালপত্রের সারি–বাক্স, স্যুটকেস, আরও কত জিনিস। ওগুলোর কাছে নিয়ে এসে প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হলো বাক্স দুটো।

তাকিয়ে আছে টেরি। এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা মালপত্র তুলে নিয়ে নিয়ে কনভেয়র বেল্টে রাখছে। বেল্ট সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছে প্লেনের কার্গো হোল্ডে।

ভালই থাকব ওখানে–নিজের মনকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইল টেরি। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনে তুলে নেয়া হবে। রওনা হব নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ওর বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়াল দুজন লোক।

অজান্তেই পেশি শক্ত করে ফেলল টেরি। এতক্ষণে জেনে গেছে, টানা-হেঁচড়ায় ব্যথা লাগে। তার জন্যে তৈরি করল দেহকে।

একটা চিৎকার আতঙ্কের স্রোত বইয়ে দিল তার ধমনীতে। কঠিন কণ্ঠে

বলে উঠল একজন লোক: 'অ্যাই, থামো! থামো! তুলো না বাক্স দুটো!'

টেরির বাক্সটা ছেড়ে দিল লোকগুলো। ঘুরে তাকাল যে লোকটা কথা বলেছে তার দিকে।

'ওই দুটো,' হাত তুলে দেখাল লোকটা। টেরিদের দুটো নয়, পাশে রাখা অন্য দুটো বাক্স।

'ওগুলো টারমিনালে নিয়ে যেতে হবে,' লোকটা বলল। 'থাক এখন। বাকিগুলো তুলে দাও আগে। পরে নিয়ো।'

দমটা আস্তে করে ছাড়ল টেরি। যাত্রাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই।

কয়েক মিনিট পরেই কনভেয়র বেল্টে তুলে দেয়া হলো টেরির বাক্সটা। কার্গো হোল্ডে বাক্সটা আছড়ে পড়ার সময় দাঁত কামড়ে রইল সে। ভয়ানক আছাড়। সাংঘাতিক ব্যথা। চিৎকার করে ওঠা থেকে অনেক কষ্টে বিরত রাখল নিজেকে।

ধুপ্ করে আরেকটা শব্দ কানে এল তার। টাকির বাক্সটা পড়েছে পাশেই।

জায়গাটা অন্ধকার। ঠাণ্ডাও এখানে বেশি। বেশ কয়েকটা কুকুর তোলা হয়েছে হোল্ডের মধ্যে। খাঁচায় আটকা থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে ওগুলো।

শব্দটা রাগিয়ে দিল টেরিকে।

কুকুরের মাংসের কথা ভেবে জিভে জল এল। খেয়ে ফেলবে নাকি ধরে? খাবারের কথা ভাবতেই পেটের মধ্যে খিদে মোচড় দিয়ে উঠল।

হাত দুটো তুলে ডালায় ঠেকাল। চাপ দিয়ে ভাঙতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। এখন এ সব করতে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। টাকিকে ডাক দিল, 'টাকি, কুকুর খেতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে!'

'খবরদার। ওকাজও করতে যেয়ো না। ভাল হওয়ার আশা চিরকালের জন্যে ছাড়তে হবে তাহলে।'

'কিন্তু ওগুলোর চিৎকার মাথা গরম করে দিচ্ছে আমার!'

'দাঁড়াও, থামাচ্ছি।'

ভয়ানক এক হাঁক ছাড়ল টেরি।

প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে গেল কুকুরগুলো। ঘেউ ঘেউ বাদ দিয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল দু'একটা, বাকিগুলো চুপ।

'টেরি, তোমার ভয় লাগছে?' টাকি জিজ্ঞেস করল।

জীবনে এত ভয় লাগেনি। কিন্তু স্বীকার করল না টেরি। 'ভয় নেই, টাকি। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো।'

বারো

'পথ হারিয়েছি আমরা!' ঘোষণা করল বোরিস।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সবাই। পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট এয়ারপোর্ট থেকে একটা জীপ ভাড়া করে এগিয়েছে ওরা। এক ঘণ্টা ধরে চলেছে বনের ভেতরের সরু একটা রাস্তা ধরে।

তারপর সামনে পড়েছে কাঁচা রাস্তা। পেছনে তখন অস্ত যাচ্ছে সূর্য। সারা আকাশে রঙের লালিমা।

কাঁচা রাস্তায় নেমে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়েছে গাড়ি। সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘন পাইনের দেয়াল।

ঘন বনে গাড়ি ঢোকানো যায়নি। অগত্যা নামতে বাধ্য হয়েছে ওরা। গাড়িটা রেখে, মালপত্র সব বের করে নিয়ে হেঁটে ঢুকেছে।

ধূসর আকাশের রঙ বেগুনি হয়ে এল। ঝুপ করে নামল বনের অন্ধকার। বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। চাঁদ নেই। তারাও না, যার ওপর নির্ভর করে পথ চিনে এগোবে।

আগে আগে হাঁটছিল বোরিস। তার হাতের টর্চের আলো নেচেছে বনের গাছপালা আর বড় বড় পাথরে। তারপর হঠাৎ করেই এল ঘোষণাটা।

'এদিক দিয়েই তো গিয়েছিলাম,' বলল সে। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি। চিনতে পেরেছি। ওই যে ছোট পাহাড়টা।...নাহ্, এতক্ষণে ঠিক পথে এগোচ্ছি। পাহাড়ের কিনার দিয়ে ওই যে রাস্তা চলে গেছে, সেটা ধরে গেলে পাওয়া যাবে মহিলার কেবিন।'

খানিক পরেই সংশয় দেখা দিল তার মনে। সত্যি এ পথেই গিয়েছিল তো?

ফিরে তাকাল রবিন। 'ওরা কোথায়?'

টেরি আর টাকি নেই ওদের সঙ্গে। থেমে দাঁড়াল সবাই।

কিশোরের প্রশ্ন, 'গেল কোথায়?'

টর্চের আলো ফেলে মুসা বলল, 'ওই যে। চলো তো দেখে আসি, কি খাচ্ছে।'

বনে ঢুকেই খাবারের সন্ধানে ছিল টেরি আর টাকি। প্রচণ্ড খিদে সহ্য করতে না পেরে ব্যাজার আর র‍্যাকুন মেরে খাওয়া শুরু করেছে। বনে পথ হারানো নিয়ে আপতত কোন চিন্তা নেই ওদের।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওদের কাঁচা মাংস খাওয়ার নমুনা দেখে মুসার পর্যন্ত গা গুলিয়ে উঠল।

টেরি আর টাকিকে তুলে নিয়ে আবার শুরু হলো অন্ধকারে টর্চের আলোয় পথ চলা। মাটিতে বিছানো শুকনো পাতার পুরু কার্পেট। পায়ের চাপে মচমচ করছে।

ছোট্ট এক টুকরো গোলাকার, ঘাসে ঢাকা জমিতে এসে পৌঁছল ওরা। লম্বা চুলে ধীরে ধীরে টান মারতে আরম্ভ করল বোরিস। অনিশ্চয়তার লক্ষণ। এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে সরাল ব্যাকপ্যাকটা। চারপাশে তাকাল। তৃতীয়বারের মত ঘোষণা করল, 'এবার বুঝতে পারছি, সত্যি পথ হারিয়েছি!'

গাছের ডালে পেঁচা ডাকল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছোট ছোট জানোয়ারের হুটোপুটি। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলফেরার খসখস, সড়সড় শব্দ।

'নিশ্চয় অন্য কোন রাস্তা আছে, একই রকম দেখতে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল বোরিস। 'একেবারে উল্টোদিকে চলে এসেছি।'

'তাহলে এখানেই ক্যাম্প করে থেকে যাই,' কিশোর বলল। 'আবারও পথ হারনোর সম্ভাবনা আছে। অন্ধকারে অহেতুক আর ঘোরাঘুরি না করে...'

'ওটা কি? আলো না?' বাধা দিয়ে বলে উঠল মুসা।

সবাই তাকাল তার নির্দেশিত দিকে। খুদে একটা কমলা রঙের আলো চোখ পড়ল সবারই। গাছপালার মধ্যে দিয়ে একবার চোখে পড়ে, আবার পড়ে না।

'আগুন নাকি?' ফিসফিস করে বলল রবিন। জোরে বললে যেন চলে যাবে আগুনটা।

মিটমিট করতে থাকা আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মনে তো হচ্ছে।'

'চলো, দেখে আসি,' বোরিস বলল।

গাছপালার ভেতর দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল ওরা। কাছে এলে চোখে পড়ল কেবিনটা। ভেতরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের আগুনের আভা পড়েছে জানালার কাঁচে।

'এটাই কি সেই মহিলার কেবিন?' জানতে চাইল টেরি। ভেতরে ঢোকার জন্যে আর তর সইছে না।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো!' উত্তেজিত হয়ে উঠল বোরিস। 'তারমানে শেষবার ঠিক পথেই এগিয়েছি।'

ভেতরটা দেখার জন্যে জানালার কাঁচে গিয়ে নাক চেপে ধরল কিশোর। দেখাদেখি মুসা আর রবিনও এসে দাঁড়াল। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় কাঁচটা গরম।

ভেতরে তাকিয়ে থেকে আলোটা চোখে সইয়ে নিতে লাগল কিশোর।

'কই, কাউকে তো দেখছি না,' মুসা বলল।

'আগুন যখন জ্বলছে,' কিশোর বলল, 'কেউ না কেউ নিশ্চয় আছে।'

'বোঝার একটাই উপায়,' কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে অস্থির ভঙ্গিতে দরজায় গিয়ে কিল মারতে শুরু করল টাকি। দমাদ্দম কিল।

জবাব এল না কেবিন থেকে।

রাগে গর্জন করে উঠল টাকি। তাকে সাহায্য করতে গেল টেরি। তিন গোয়েন্দা বা বোরিস বাধা দেবার আগেই এত জোরে কিল মারতে লাগল, মড়মড় করে ভাঙতে শুরু করল কাঠের চিলতে।

উৎসাহ পেয়ে আরও কিলানোর জন্যে মুঠি তুলতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। দরজায় দাঁড়ানো সাদা-চুল এক মহিলা। হাতে একটা হান্টিং রাইফেল। বড় জানোয়ার শিকার করার।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল মহিলা, 'সরো! সরে যাও আমার দরজা থেকে! নইলে গুলি খেয়ে মরবে!'

তেরো

গর্জন করে উঠল টাকি।

রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকাল মহিলা।

'সরো! ভাগো!'

'প্লীজ!' এগিয়ে গেল বোরিস, 'গুলি করবেন না। আপনার কাছেই এসেছি আমরা।'

বোরিসের দিকে ঘুরে গেল রাইফেলের নল। ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে মহিলার চোখ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর নরম হলো দৃষ্টি।

'আপনি!...বোরিস না?'

'হ্যাঁ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বোরিস। 'চিনতে তাহলে পারলেন।'

কিন্তু রাইফেল নামাল না মহিলা। বোরিসের বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আবার এলেন কেন?'

'আপনার সাহায্য দরকার,' বোরিস বলল। 'এই ছেলেগুলোর...' টেরি আর টাকিকে দেখাল সে। 'ভীষণ বিপদে পড়েছে ওরা। একমাত্র আপনিই ওদের এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন।'

আরেকবার দ্বিধা করে অবশেষে রাইফেল নামাল মহিলা। তবে সতর্ক থাকল, প্রয়োজন পড়লেই আবার যাতে ঝট করে তুলে নিতে পারে। বোরিসের পেছনে দাঁড়ানো তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল। নজর ফেরাল টেরি আর টাকির দিকে। কুঁচকে গেছে ভুরু। কপাল আর গালে ভাঁজ

পড়েছে শুকনো ফলের মত।

কেঁপে উঠল সে। গায়ের চাদরটা ভালমত টেনে দিল। বোরিসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ওদের? কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'চাঁদের অসুখ,' বোরিস বলল। 'হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে এখন এই অবস্থা।' ভারী ব্যাকপ্যাকটাকে কাঁধ বদল করল আবার। এই ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার।

'ওরা কারা?' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল মহিলা।

'ওরা এদের ব...' বন্ধু বলতে গিয়েও থেমে গেল বোরিস, কারণ জানা আছে, টেরি-বাহিনী মোটেও বন্ধু নয় তিন গোয়েন্দার। 'শত্রু' বললেও ঝামেলা। মহিলাকে বোঝানোর জন্যে অনেক কথা খরচ করতে হবে তখন। শেষে বলল, 'এদের শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'কি যেন বললেন? কি হয়েছে এদের? চাঁদের অসুখ!'

এখনও দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা, ভেতরে যেতে দিচ্ছে না ওদের। এক হাত রাইফেলের নলে। 'সেই যে গল্পটা বলেছিলাম আপনাকে?'

'গল্প নয়, বাস্তব, দেখতেই তো পাচ্ছেন,' বোরিস বলল। 'সেদিন আপনার কাছে শুনে আমার কাছেও গল্পই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটা সত্যি। যদিও এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'অসম্ভব!' ভ্রূকুটি করল মহিলা। 'গল্প গল্পই। হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের অসুখ হয়, চন্দ্রজ্বরে ধরে মানুষকে, ওটা শুধুই গল্প। কোন সত্যতা ছিল না এর মধ্যে।'

'তাহলে হলো কি করে আমাদের!' ধমকে উঠল টেরি। 'আপনার কি ধারণা চামড়ার পোশাক প'রে নেকড়ে-মানব সেজে আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছি আমরা?'

'হ্যাঁ, এই যে দেখুন,' টেনে দেখাল টাকি, 'সত্যিকারের লোম।'

রাইফেলের নলে শক্ত হলো মহিলার আঙুল। 'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল। ঝাঁকি লেগে সাদা চুলগুলো নেচে উঠল গায়ের নীল চাদরটার ওপর। বুড়ো চোখের মণি দুটোকে লাগছে পানিতে ভর্তি, টলটলে। বোরিসের দিকে তাকাল, 'এই উদ্ভট গল্প শোনাতে কেন এসেছেন? পাগল পেয়েছেন আমাকে?'

মহিলার কথায় শঙ্কিত হয়ে উঠল বোরিস। 'ওদের কি আপনি সাহায্য করতে পারবেন না? কত রকম ওষুধই তো আপনার জানা। চন্দ্রজ্বরের কি কোন চিকিৎসা নেই?'

'কি করে জানব?' কাটা কাটা জবাব দিল মহিলা। 'যে রোগটা হয় মানুষের জানতামই না কখনও, তার ওষুধ দেব কি করে?'

দৃষ্টি বিনিময় করল টাকি আর টেরি। নিরাশায় ভরে উঠল মন। ভয়ঙ্কর

এক দানবীয় খোলসে আটকা পড়েছে ওরা চিরকালের জন্যে! কেউ ওদের ভাল করতে পারবে না আর।

এগিয়ে এল কিশোর, 'আপনার জানামত এমন কি কেউ নেই, যে ওদের ভাল করতে পারে?'

টেরি আর টাকির মনে ক্ষীণ আশার পরশ বুলাল মহিলার পরের কথাটা, 'এ বনে একজন লোক আছে, যার পক্ষে ওদের ভাল করা সম্ভব হলেও হতে পারে।'

'কে!'

'কে!'

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল টেরি আর টাকি।

ওদের বিকৃত, জানোয়ারের মত চিৎকার কাঁপিয়ে দিল মহিলাকে।

'ডক্টর ম্যাডের কাছে ওদের নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন,' বোরিসকে বলল মহিলা। 'লোকটার আসল নাম কেউ জানে না। আধপাগল, খেপাটে স্বভাবের বলেই তার নাম হয়ে গেছে ডক্টর ম্যাড। সত্তর বছর ধরে এ বনে বাস করছে সে। তার কাছে যেতে ভয় পায় লোকে। তার একটা ছেলে আছে। ওটাও নাকি পাগল। তবে ওই ডাক্তারই আপনাদের একমাত্র ভরসা।'

ভাঁজ পড়া চিবুকে হাত বোলাল মহিলা। 'মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার, হাতুড়ে নয়। কাজেই কোন উপায় হলেও হতে পারে।'

'কোন্‌দিকে তার বাড়ি?' জিজ্ঞেস করল বোরিস।

হাত তুলে দেখাল মহিলা। হাতটা কাঁপছে। 'এই রাস্তা ধরে চলে যান। বেশি দূরে না। বনের মধ্যে যারা বাস করি আমরা, কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি। আপদ-বিপদের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল বোরিস। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যা'ম। আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

জবাব দিল না মহিলা। দরজাটা লাগিয়ে দিল। ছিটকানি, খিল, যা কিছু আছে, সব লাগিয়ে দিল একে একে। শব্দ শোনা গেল বাইরে থেকেও।

যে পথে এসেছিল, সে-পথে আবার ফিরে চলল কিশোররা। মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। পাইনের বনে রহস্যময় ছায়া ফেলেছে। ঘোলাটে আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল ওরা।

চুপ করে আছে টেরি আর টাকি।

ওদের জন্যে এ মুহূর্তে মায়াই লাগছে কিশোরের। হয়তো সেই পাগলা ডাক্তার সত্যি ওদের রোগ ভাল করে দিতে পারবে।

দেখা যাক!

চোদ্দ

মহিলা বলেছে, ডাক্তারের বাড়িটা কাছেই। কিন্তু বহুক্ষণ হেঁটে এসেও বাড়ির চিহ্ন চোখে পড়ল না। প্রায় দুই ঘণ্টা হেঁটে ফেলেছে।

অবশেষে বাড়িটা যখন চোখে পড়ল, গাছপালার মাথার ওপারে তলিয়ে যাচ্ছে চাঁদ। ভোরের সূর্যালোক চওড়া লাল ফিতের মত ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্তে।

বাড়িটা লম্বা। নিচু চালা। কাঠের তৈরি।

কাছে যাওয়ার পর মুসা বলল, 'অত জাল দিয়ে কি করে?'

বাড়ির চারপাশে লম্বা খুঁটি গেড়ে মাছ ধরার জালের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। আরেকটা জাল ছড়ানো রয়েছে মাথার ওপরে, বাড়িতে ঢোকার দরজা থেকে রাস্তা পর্যন্ত।

'নিশ্চয় মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করে না ওগুলো,' রবিন বলল। 'কয়েক মাইলের মধ্যে তো পানি চোখে পড়ছে না।'

বাড়িটা রয়েছে একটা ঢালের ওপর। পাইন গাছের ছায়ায়।

ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে লম্বা ঘাসের মধ্যে লালমত একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের।

কি ওটা? নৌকা?

সে কিছু বলার আগেই মোটাসোটা একজন লোককে দেখা গেল, ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে ওদের দিকে। লম্বা লাল চুল কাঁধ ছাড়িয়েছে, সিংহের কেশরের মত দেখাচ্ছে। গায়ে ওভারঅল আর একটা সাদা সোয়েটার।

'আপনি ডাক্তার ম্যাড?' বোরিস জিজ্ঞেস করল।

জবাবে হেসে উঠল লোকটা। হাঁটার তালে তালে ভুঁড়ি নাচছে।

কাছে এসে টেরি আর টাকিকে দেখে থমকে গেল। 'আরি!' চিৎকার করে উঠল, 'কি হয়েছে ওদের?'

'আপনি কি ডাক্তার ম্যাড?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করল আবার বোরিস।

মাথা নাড়ল লোকটা। ঝাঁকি লেগে নেচে উঠল গালের থলথলে ফোলা মাংস। 'না, স্যার, আমি তার ছেলে।'

টেরি আর টাকির দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'আমার নাম আসলে বেরি। কিন্তু সবাই ডাকে লায়ন।'

'লায়ন? মানে সিংহ?' বোরিস বলল, 'নিশ্চয় ওই কেশরের মত চুলের

জন্যে?'

হেসে উঠল বেরি। 'হবে হয়তো।'

লাল জিনিসটা নৌকাই। ওটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এই শুকনোর মধ্যে নৌকা দিয়ে কি করেন?'

জবাব দেয়ার আগে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল বেরি। ঢালের নিচটা দেখিয়ে বলল, 'এখন শুকনো বটে, কিছুদিন পরেই পানিতে থই-থই করবে। মাছে ভরে যাবে। ধরা পড়বে জালে।'

'তারমানে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'বৃষ্টির দিন আসছে,' ভবিষ্যদ্বাণী করার মত করে বলল বেরি। ফোলা গাল ডলল। একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেল তার গোল-আলু মুখে। 'সারা বন ডুবে যাবে বন্যার পানিতে। নদীর মত স্রোত বইতে থাকবে। সে-সবের জন্যে তৈরি থাকি আমি আর বাবা।'

নৌকাটার একপাশে লাথি মারল সে। 'এ বনে আমরাই শুধু সব কিছুর জন্যে রেডি থাকি।'

আসলেই পাগল, বুঝতে পারল কিশোর।

এর বাবাও যদি এরই মত পাগল হয়, টেরি ও টাকির কোন আশা নেই আর।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ করে টেরির ঘাড়ের লোম চেপে ধরল বেরি। হ্যাঁচকা টান মারল।

ব্যথায় 'আউ' করে উঠল টেরি।

তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল বেরি। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। 'অ, আসলই!' চোখ সরু সরু করে তাকাতে লাগল টেরি আর টাকির দিকে। 'তোমরা কি সত্যিকারের মানুষ? নাকি শিম্পাঞ্জীর সঙ্কর?'

রাগ দমন করতে না পেরে গর্‌গর্‌ করে উঠল টাকি। এক পা আগে বাড়ল।

শঙ্কিত হলো কিশোর। মারামারি বাধাতে চায় নাকি!

টেরির দৃষ্টিও ভাল না। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, বেরিকে মেরে খেয়ে ফেলতে চায়।

তবে অঘটন ঘটতে দিল না বোরিস। তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। 'বেরি, এই ছেলেগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে আপনার বাবার কাছে। উনি তো ডাক্তার, তাই না?'

'এ কথাই তো বলে বেড়ায় সবাইকে,' জবাব দিল বেরি। জোরাল বাতাস বয়ে গেল। ঘাড়ের কেশর উড়াল তার। খুঁটিতে জড়ানো জালগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে গেল।

'ছেলে দুটো বিপদে পড়েছে,' আবার বলল বোরিস। 'ডাক্তার সাহেবের

সঙ্গে কি দেখা হবে এখন?'

খিকখিক করে হাসল বেরি। কৌতুকে নেচে উঠল কুতকুতে চোখ। যেন খুব মজা পাচ্ছে। হাড্ডিসার একটা আঙুল নেড়ে ডাকল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

হাসিটা রহস্যময় লাগল কিশোরের কাছে। আঙুলটা অদ্ভুত! অত মোটা শরীরের এ রকম আঙুল হয় কি করে?

কোন কথা না বলে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল বেরি।

নীরবে তাকে অনুসরণ করল অভিযাত্রীরা।

পাশের একটা দরজা দিয়ে সবাইকে ঘরে নিয়ে এল বেরি। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। ছোট ফায়ারপ্লেসে সারারাত আগুন ছিল। এখন ধিকিধিকি জ্বলছে শুধু লাল কয়লা।

ঘরের একধারে কতগুলো তাক। তাতে নানা রকম প্রাণীর হাড়গোড়, পাখির পালক, ঠোঁট, নখ, শুকনো গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়। চালার কাছে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে মাকড়সার জালের মত বানানো হয়েছে। কেন, বেরিই জানে। হতে পারে, পাগলামি। বড় একটা টেবিলে প্রচুর শিশি-বোতল দেখা গেল। আরেক দিকের দেয়াল ঘেঁষে বইয়ের তাক। জিনিসপত্রে বোঝা যাচ্ছে, ডক্টর ম্যাড পাগল হলেও সত্যি ডাক্তার।

লম্বা সরু ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোয়াল ডলল বেরি।

'আপনার বাবা কোথায়?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল বোরিস। 'দেখা করাটা সত্যি জরুরী। বুঝতে পারছেন না? উনি কোথায়?'

রহস্যময় আরেকটা হাসি খেলে গেল বেরির মুখে। 'তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা।'

'কি বলছেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না!'

এক টানে মাথা থেকে লাল চুলগুলো খুলে নিয়ে এল বেরি।

পরচুলা!

বেরিয়ে পড়ল সাদা, পাতলা, বুড়ো মানুষের চুল।

পরচুলা খোলার পর ঘন ঘন কয়েক টানে গাল থেকে খুলে আনলেন নানা আকারের রবার। ফোলা থলথলে গাল উধাও হলো। বেরিয়ে এল চোয়াল বসা গাল। কাপড়ের নিচ থেকে ভুঁড়িটাও খুলে ফেলে দিলেন বৃদ্ধ।

ছদ্মবেশে ছিলেন!

অবাক হয়ে তাঁর কাণ্ড দেখছে তিন গোয়েন্দা। বোরিস চুপ। টেরি আর টাকিও চুপ।

হাসি চলে গেছে ডাক্তারের মুখ থেকে। 'একটা ছেলের জন্যে সারাটা জীবন কি মর্মান্তিক যাতনাতেই না কেটেছে আমার। কিন্তু কোনভাবেই একটা ছেলে পাইনি। সে-জন্যে নিজের মধ্যেই তাকে তৈরি করে নিই।

আমিই আমার ছেলে হই, আবার বাবা হই।'

মহিলা ঠিকই বলেছে, ভাবল কিশোর, ডক্টর ম্যাড আসলেই পাগল। বদ্ধ উন্মাদ। টেরি আর টাকিকে এই লোক কি চিকিৎসা করবেন?

'বনের মধ্যে এখানে বড়ই নির্জন,' বলে চলেছেন ডক্টর ম্যাড। 'নিঃসঙ্গতা সইতে পারি না। বেরিকে কাছাকাছি রাখলে একাকীত্ব বোধটা কাটে।'

মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা লাল পরচুলাটার দিকে তাকাল বোরিস। মুখ তুলল ম্যাডের দিকে। 'ডক্টর ম্যাড, আপনি এই ছেলে দুটোকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারেন? চাঁদের অসুখের ওষুধ কি জানা আছে আপনার?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে টেরি আর টাকির দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যাড। জিভ দিয়ে টোকা দিচ্ছেন দাঁতে।

রাগ দানা বাঁধতে শুরু করল টেরির মগজে। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। ঘর, ঘরের জিনিসপত্র, জানালা-দরজা সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে যদি পারত, রাগ হয়তো কমত কিছুটা।

অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কিছুই করার নেই যেন তাদের। এ কোনও রহস্য নয় যে সমাধান করবে; অ্যাডভেঞ্চার নয়, দুঃসাহসী, নির্ভীক অভিযাত্রীর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ এক অদ্ভুত, অজানা রোগের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই, যার সমাধান কেবল ডাক্তারই দিতে পারেন।

টেরির মতই টাকিরও রাগ মাথা চাড়া দিচ্ছে। সব রাগ গিয়ে পড়ল ডাক্তার ম্যাডের ওপর। যুক্তিতর্কের ধার ধারল না। সে ভাবছে, ডাক্তার ম্যাড পাগল, এ রোগের ওষুধ তিনি জানেন না। আর জানেন না বলেই ওদেরকে চিরকাল দানব থেকে যেতে হবে।

আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বইয়ের তাকের দিকে হেঁটে গেলেন ডক্টর ম্যাড। আপনমনে গুনগুন করতে করতে তাক থেকে টেনে নামালেন পুরানো, ধুলো পড়া গোটা তিনেক মোটা মোটা বই। গুঙিয়ে উঠলেন ওগুলোর ভারে। বয়ে নিয়ে এসে ফেললেন পড়ার টেবিলে।

সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বইগুলো টেনে নিয়ে একমনে পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল টেরি আর টাকি। তিন গোয়েন্দা ও বোরিস তাকিয়ে আছে আগ্রহী, কৌতূহলী দৃষ্টিতে। কেউ কোন কথা বলছে না।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুললেন ডাক্তার। 'এত ছোট লেখা, পড়তে কষ্ট হচ্ছে। বুড়ো মানুষের চোখ তো। বেরিকে দিলে বরং ভাল করে পড়তে

পারত।'

'কিছু কি পেলেন?' উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল বোরিস। 'কোন ওষুধ?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'না, ওষুধ পাইনি। ওই ধরনের কোন রোগের উল্লেখ নেই মেডিক্যাল সাইন্সে। তবে ইনডিয়ান ওঝারা বলে, এ রোগে যদি কাউকে ধরে, পরবর্তী পূর্ণিমার জন্যে অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। যদি ততদিন বেঁচে থাকে, আবার চাঁদের দিকে তাকালে তার অসুখ ভাল হয়ে যাবে।'

এতটাই হতাশ হলো টেরি, ধপ করে মেঝেতেই বসে পড়ল। টাকির চোখ জ্বলে উঠল। সব রাগ গিয়ে পড়ল আবার টেরির ওপর। টেরির দোষেই ওদের আজ এই দুরবস্থা।

তার মনোভাব বুঝে ফেলল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, 'বোরিসভাই, ওকে ধরুন! ও মারামারি করতে যাচ্ছে!'

সবাই মিলে ধরে ফেলল টাকিকে। ঠেকাল।

'এক কাজ করো তোমরা, আমার এখানেই থেকে যাও,' টেরি আর টাকিকে পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। 'শহরে, মানুষের মাঝে গিয়ে বাস করতে পারবে না। তোমাদের জন্যে জঙ্গলেই এখন মঙ্গল।'

'কথাটা আপনি মন্দ বলেননি,' বোরিস বলল। 'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন?'

'আপনারা এতদিন থেকে কি করবেন? বাড়ি চলে যান,' ডাক্তার বললেন। 'পরের পূর্ণিমার সময় নাহয় চলে আসবেন আবার। ততদিনে দেখি, আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি ওদের।'

পনেরো

'কিছু কিছু খারাপ জিনিসেরও ভাল দিক থাকে,' ডাক্তার ম্যাড বলেছেন। 'তোমাদের জন্যে সেই ভালটাই আমি বের করে আনব। আমি তোমাদের বিখ্যাত বানিয়ে দেব।'

সেটা তিন সপ্তাহ আগের কথা।

চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মত খাঁচায় থাকতে হচ্ছে টেরি আর টাকিকে। ভ্যান গাড়িতে করে ভ্রমণ করছে। কার্নিভাল, মেলা, সার্কাস– যেখানেই ওদের দেখানোর সুযোগ হচ্ছে, দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার, টিকিটের বিনিময়ে।

খাঁচার ওপরে লেখা:

ডাক্তার ম্যাডের দানব পুত্র।
এক সময় এরা মানুষই ছিল।
এখন জন্তুতে পরিণত হয়েছে।

পাঁচ ডলারের টিকেট কেটে ওদের দেখতে আসে লোকে। প্রচণ্ড ভিড় হয়। মেলা বা কার্নিভালের প্রধান আকর্ষণ ওরা।

মানুষেরা চলে গেলে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে টেরি আর টাকি। তাদের বোঝান ডাক্তার, 'এটাই তোমাদের জন্যে শান্তি। এরচেয়ে বেশি আর পাবে না। তোমরা কি মনে করো, বাড়ি ফিরে গেলেই শান্তি পাবে? পথে বেরোতে পারবে না, স্কুলে যেতে পারবে না, সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে হবে। সেটাও খাঁচা। এখানে তো তা-ও ঘুরে বেড়াতে পারছ। ওখানে তা-ও পারবে না। আর টিকিটের দাম নিচ্ছি কেন জানো? তোমাদের জন্যেই। রাক্ষুসে খিদে তোমাদের। এত খাবারের জোগান দেব কোত্থেকে আমি?'

চুপ হয়ে যায় টেরি আর টাকি। আসলে ওরা পরবর্তী পূর্ণিমার অপেক্ষায় রয়েছে। তাই ডাক্তারের কথায় বিশেষ তর্কটর্ক করে না। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে যে এরচেয়ে ভাল থাকতে পারবে না, এটাও বোঝে। ঘুরে বেড়াতে খারাপ লাগে না, তবে দর্শকদের ওপর প্রায়ই খাপ্পা হয়। বড় বিরক্ত করে ওরা।

দুজনের দিকে আঙুল তুলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ওরা। হাসাহাসি করে। বাদাম আর পপকর্ন ছুঁড়ে দেয় কেউ কেউ খাঁচার ফাঁক দিয়ে। খেপানোর চেষ্টা করে। গর্জন শুনতে চায়। এ সবই অবশ্য করতে পারে ওরা, ডাক্তার যখন কাছাকাছি না থাকেন।

ওরা দুজনের নাকে খোঁচা মারার চেষ্টা করে। লোম ধরে টানে।

একদিন একটা লোক খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেরির পায়ে সুড়সুড়ি দিয়েছিল। এত রাগ হয়েছিল টেরির, হাত চেপে এমন জোরে টান মেরেছিল, আরেকটু হলেই ছিঁড়ে যেত লোকটার হাত।

এরপর থেকে ডাক্তার আর খাঁচার কাছে আসতে দেন না কাউকে। মোটা দড়ির বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখেন খাঁচা। কয়েক ফুট দূর থেকে দেখতে হয় দর্শকদের।

খাঁচার দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়। খেপে গিয়ে যাতে দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে টেরি আর টাকি।

জন্তু হয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে এখন নিজেদের জন্তুই ভাবতে আরম্ভ করেছে দুজনে। লোকের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়ানোর জন্যে

যত রকম প্রচেষ্টা, সব করে।

কিন্তু মানুষেরা ভয় পায় না। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। মজা পায়।

ওদের হাসি খেপিয়ে তোলে টেরি আর টাকিকে। আরও জোরে গর্জন করে ওরা। যত বেশি গর্জন করে, তত বেশি মজা পায় লোকে। দর্শকের ভিড় বাড়ে।

শেষ হয়ে আসছে অপেক্ষার দিনগুলো। সেদিন গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকাল টেরি। চাঁদটা অনেক বড় হয়েছে। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে যেন আকাশের মাঝখান দিয়ে।

টাকিকে ডেকে দেখাল।

খানিক দূরে খোলা জায়গাতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন ডাক্তার। ওদের কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। উঠে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো? এত রাতে জেগে আছো কেন? খিদে লেগেছে?'

খিদে ওদের সব সময়ই লেগে থাকে।

বড় একটা ট্রে'তে করে মাংস নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিলেন দুজনের দিকে।

টেনে নিয়ে গপগপ করে খেতে লাগল দুজনে। কাঁচা মাংস। জানোয়ারের মত নখ আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে, সস্নেহ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার।

পাগলামি অনেক কেটে গেছে তাঁর। নিঃসঙ্গতা নেই। নিজেই নিজের ছেলে সাজার আর প্রয়োজন বোধ করেন না।

ষোলো

পূর্ণিমার দিন।

সকাল থেকেই অস্থির হয়ে রইল টেরি আর টাকি। দিন যেন আর কাটেই না। খাঁচার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে ছটফট করতে থাকল দুজনে।

তবে যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক, সময় বসে থাকে না। শেষ দর্শকটাও বিদায় নিল। মলিন হয়ে এল দিনের আলো। চাঁদের দিকে তাকাল টেরি। পুরো গোল হয়ে গেছে চাঁদটা।

'সবচেয়ে শয়তান ওই পোলাপানগুলো,' তিক্তকণ্ঠে বলল টাকি। 'আমাদেরকে যেন বাঁদর পেয়েছে। কলার খোসা ছুঁড়ে মারে। খ্যাকখ্যাক করে হাসে।'

এ কথার জবাব দিল না টেরি। রোগটা হওয়ার আগে একই কাজ

ওরাও করেছে চিড়িয়াখানায় গিয়ে। বানরের দুঃখ বোঝেনি। ভোগান্তিটা নিজের না হলে মানুষ কিছু বোঝে না। বলল, 'চাঁদটা দেখেছ?'

'দেখব আর কি? ওটার দিকেই তো তাকিয়ে আছি সারাক্ষণ।'

'কিন্তু আজকে এখনও খাবার দিতে আসছে না কেন ডাক্তার? না বেরোলে, জ্যোৎস্নায় গা ধুতে না পারলে তো কোন লাভ হবে না।'

'চলে আসবে। কার্নিভাল শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পরে তো আসে। এখনও সময় আছে।'

কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি পার হয়ে গেল। ডাক্তার আর আসেন না।

বার বার ডাক্তারের ট্রেলারটার দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

ক্রমেই আকাশের ওপরে উঠছে চাঁদ। গাছের পাতায় ফিসফিস, কানাকানি করে যাচ্ছে বাতাস। কার্নিভালের তাঁবুর কানা পতপত করছে।

ট্রেলারের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে।

ট্রেলারটার আলো নেভানো। কোনও জানালায় আলো নেই। অন্যদিন বেশির ভাগ সময় বাইরেই থাকেন ডাক্তার, হাঁটাহাঁটি করেন, বসে বসে প্রকৃতি দেখেন; কিংবা কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। আজ নেই।

কেন আসছেন না? রাতের খাবার নিয়ে আসারও কোন লক্ষণ নেই।

হঠাৎ টেরি বুঝে ফেলল কারণটা। লাফ দিয়ে উঠে বসল। 'টাকি! ডাক্তার আসবে না!'

'আসবে না মানে? কি বলছ? আসবেই!' চিৎকার করে উঠল টাকি।

'না, আসবে না। আজ যে পূর্ণিমা। আমরা ভাল হয়ে যাই, ডাক্তার এটা চায় না!'

'কেন?'

'গাধাই থেকে গেলে চিরকাল!' গুঙিয়ে উঠল টেরি। 'বুঝতে পারছ না? ডাক্তার আমাদের চিরকাল জন্তুই রেখে দিতে চান। তাহলে যাব না আমরা। তাঁর ছেলের অভাব পূরণ হবে। নিঃসঙ্গ থাকতে হবে না আর তাঁকে। আজ রাতে আমাদের খাঁচার দরজা খুলতে আসবেন না তিনি।'

'নিকুচি করি তার ছেলের অভাবের!' এতক্ষণ নির্লিপ্ত থাকলেও টেরি বুঝিয়ে দেয়ার পর লাফ দিয়ে উঠে বসল টাকি।

তার চোখে ভয় দেখতে পেল টেরি।

'টাকি,' আকাশের দিকে দেখাল টেরি, 'দেখো। চাঁদটা প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় চলে যাচ্ছে। আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। যা করার এখুনি করতে হবে।'

'কি করব?'

*

শিকের ফাঁক দিয়ে ডাক্তারের ট্রেলারের দিকে তাকাল টেরি।

আবার চাঁদের দিকে মুখ তুলল।

ডাক্তারের যুক্তি, বাড়ির চেয়ে এখানে ভাল থাকবে ওরা। কিন্তু কই? দর্শকরা যে ভাবে কলার খোসা ছুঁড়ে দেয়, ব্যঙ্গ করে, তাতে মানসিক স্বস্তি আর কোনমতেই থাকে না।

নাহ্, ওসব শয়তান লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে থাকার আর কোন মানে হয় না। চিরকাল যদি জন্তু হয়েও বাঁচতে হয়, তা-ও থাকবে না আর এখানে। অনেক হয়েছে।

আবার ডাক্তারের ট্রেলারের দিকে তাকাল সে।

দরজা বন্ধ। জানালায় আলো নেই।

ডাক্তার আসবেন না আজ। আরও একটা কথা ভাবছে সকাল থেকেই–কিশোররাও এসে পৌছায়নি, ওদের কি হলো? ওরা কি আসবে না? বাবার কথা ভেবে অভিমানে বুক ভরে উঠল টেরির। একটিবারের জন্যে চোখের দেখা দেখতে আসতে পারছে না? নাকি সেই যে ইটালিতে ব্যবসার কাজে গেছে, আর রকি বীচে ফেরেইনি?

হতে পারে। টাকির বাবা-মাও হ্যালোউইনের ছুটিতে ইয়োরোপে চলে গেছেন। মাস দুই থাকার কথা। নিশ্চয় রকি বীচে ফেরেননি। তাহলে ছেলেকে দেখতে চলে আসতেন।

কেউ আসুক বা না আসুক, সে পরের কথা, আপাতত খাঁচা থেকে বেরোনোর চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল টেরি।

রাগ দানা বাঁধতে শুরু করল মগজে। প্রচণ্ড রাগ। হাপরের মত ফুলে উঠতে লাগল বুক।

চিৎকার করে গলা ফাটাতে হবে। গর্জন করতে হবে। নইলে বুঝি খুলিটা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে, চোয়াল ফাঁক করে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল সে।

রাগটা সংক্রমিত হলো টাকির মাঝেও। একই ভাবে সে-ও এক হুঙ্কার ছাড়ল।

তারপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচার দরজায়।

খেপে ওঠা হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জনের পর গর্জন করতে করতে ধাক্কা দিতে শুরু করল দরজায়। শিক ধরে টানাটানি করতে লাগল। দরজার চৌকাঠ কাটতে লাগল ধারাল দাঁত দিয়ে। লাথি মারল প্রচণ্ড শক্তিতে।

ওদের মিলিত শক্তির অত্যাচার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না দরজাটা। ভেঙে পড়ে গেল।

আনন্দে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল দুজনে। মাটিতে লাফিয়ে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল ধবধবে সাদা জ্যোৎস্নায়।

টাকির হাত ধরে টান দিল টেরি। 'জলদি চাঁদের দিকে তাকাও! সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে!'

পেছনে চিৎকার শোনা গেল।

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এসেছেন ডাক্তার। দৌড়ে আসছেন ওদের দিকে। হাতে একটা বন্দুক।

বন্দুক! গুলি করবেন নাকি?

না। তা তিনি করলেন না। তবে কাছে এসে দুজনকে হুমকি দিতে শুরু করলেন, এখুনি খাঁচায় ফিরে না গেলে গুলি করবেন।

কানে তুলল না টেরি বা টাকি।

'জলদি!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'খাঁচায় ঢোকো বলছি!'

বন্দুক তুলে এক পা এগিয়ে এলেন।

আচমকা এক পাশ থেকে লাফ দিল টাকি। ডাক্তারের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। বন্দুকের নলটা সরে গেল একপাশে। লাফ দিয়ে গিয়ে নল ধরে হ্যাঁচকা টানে সেটা কেড়ে নিল টেরি। দানবীয় শক্তিতে পাথরের ওপর বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল বাঁটটা। ভাঙা বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

জন্তুর রাগ অন্ধ করে দিল ওদের মগজ। ডাক্তারকেও ছাড়ল না ওরা। দুজনে মিলে তাঁকে তুলে ধরে বন্দুকটার মতই ছুঁড়ে ফেলল। নরম মাটিতে ঘাসের ওপর পড়ায় বেঁচে গেলেন তিনি, নইলে হাড়গোড় ভাঙত নির্ঘাত।

তারপরেও ছাড়ল না। আবার তুলে নিল মাটি থেকে। দুজনে মিলে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে চলল খাঁচাটার দিকে। ছুঁড়ে ফেলল খাঁচার মধ্যে।

এতক্ষণে আবার চাঁদের দিকে তাকানোর কথা মনে পড়ল টেরির।

'টাকি! জলদি! সময় নেই!'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণ চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল দুজনে।

রূপালী চাঁদের আলো যেন ধুয়ে দিতে লাগল ওদের দেহ।

ঠাণ্ডা, মোলায়েম আলো।

কাজ হবে তো?

সত্যি রোগ সারিয়ে দেবে ওদের?

সতেরো

দাঁড়িয়েই আছে ওরা। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা পার হয়ে গেল। লম্বা লোমে কাঁপন তুলছে বাতাস। পেছনে পতপত করছে তাঁবুর কানা।

কই, ভাল তো হচ্ছে না! সাদা জ্যোৎস্না কোন উপকারই করতে পারছে

না ওদের। সুস্থ হচ্ছে না ওরা।

একবিন্দু পরিবর্তন ঘটছে না শরীরে। একই রকম থেকে যাচ্ছে।

পেছনে শব্দ হতে ফিরে তাকাল টেরি।

খাঁচা থেকে নেমে এসেছেন ডাক্তার ম্যাড। কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ভাল তোমরা হবে না। আমি জানি। বিশ্বাস করো। ভাল করার উপায় থাকলে সত্যি ভাল করে দিতাম তোমাদের। ইনডিয়ানদের গুজব গুজবই...'

জবাবে প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল টেরি। অসহায়ের চিৎকার।

'দুঃখ ভুলে যাও, মাই সান,' গভীর মমতায় বললেন ডাক্তার। 'পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে শান্ত হবার চেষ্টা করো। এখন থেকে এটাই তোমাদের বাড়ি।'

না! না! না!

বলতে গেল টাকি। নেকড়ের মত লম্বা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘায়িত, বিকৃত চিৎকার।

'না, না! এটা আমাদের বাড়ি হতে পারে না! চিরকাল চিড়িয়াখানার জানোয়ার হয়ে কাটাতে পারব না আমরা!' আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল টেরি। 'তারচেয়ে বরং আত্মহত্যা করব!'

*

পরদিন সকাল বেলা এসে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা। বোরিস এবার আসেনি। গোয়েন্দাদের সঙ্গে এসেছেন টেরির বাবা। প্রথমে গিয়েছিল তারা ডাক্তারের বনের কুটিরে। সেখানে না পেয়ে খোঁজ করতে করতে এসে হাজির হয়েছে ছোট শহরটায়, যেখানে এখন কার্নিভাল চলছে।

তাদের দেখে টেরি আর টাকি খুশি হলো। কিন্তু ডাক্তার হলেন না। গম্ভীর, বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

সারাটা রাতই চাঁদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে টেরি আর টাকি। ভোর হলো। গাছপালার মাথার আড়ালে হারিয়ে গেল চাঁদ। পুবের আকাশে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ার পর আর সহ্য করতে পারেনি ওরা। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে জানোয়ারের মত চিৎকার করে কেঁদেছে।

আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার। ভাল ভাল কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

'বাড়ি ফিরে গিয়ে কি করবে?' বললেন তিনি, 'স্কুল, লেখাপড়া, সবই তো গেল। এখানেই থেকে যাও। আমার কাছে।'

কিন্তু থাকতে দিতে রাজি হলেন না টেরির বাবা।

টেরিদের রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তে আবার পাগলামি শুরু হয়ে গেল ডাক্তারের। খুঁজে বেড়াতে শুরু করলেন তাঁর লাল পরচুলাটা। টেরি আর

টাকিকে পাওয়ার পর যেটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

*

কার্গো হোল্ডে করেই আবার বাড়ি ফিরে চলল টেরি আর টাকি।

সারাটা পথ বাক্সের মধ্যে গুম হয়ে রইল ওরা। কোন কথা বলল না। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

সারাটা জীবন জানোয়ার হয়ে থাকা আর কেউ ঠেকাতে পারল না ওদের...

এয়ারপোর্টে নেমে একটা ভ্যান ভাড়া করলেন টেরির বাবা। বাক্স থেকে বের করলেই লোকের ভিড় জমে যাবে, তাই বাক্সতে করেই ভ্যানে তোলা হলো দুজনকে।

টাকির বাবা-মা ফেরেননি। দুঃসংবাদটা এখনও দেয়া হয়নি ওদের, আশায় আশায়, যে আবার ভাল হয়ে উঠবে টাকি।

পথে স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিলেন টেরির বাবা। বার বার ধন্যবাদ দিলেন ওদের, টেরি আর টাকির জন্যে অনেক করেছে বলে।

*

বিকেল বেলা দুজনকে দেখতে টেরিদের বাড়িতে এল তিন গোয়েন্দা। টাকি ওখানেই আছে। একলা বাড়িতে যেতে দেননি টেরির বাবা।

কোনভাবেই পরাজয়টা মেনে নিতে পারছে না কিশোর। টেরি ও টাকিকে ভাল করার উপায়টা বের না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

অবশ্য সে করবেই বা কি? সে তো আর ডাক্তার নয়। কত জায়গা তো ঘুরে এল। লাভ তো কিছু হলো না।

রকি বীচে ফেরার পর থেকে একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে কিশোরের; প্রবীণ এক ডাক্তার বলেছিলেন: চিকিৎসা করার আগে প্রথমে ভাল করে জেনে নাও রোগটা আসলে কি, কিভাবে এর উৎপত্তি; যত কঠিন রোগই হোক, সারানোর ব্যবস্থা তুমি করে ফেলতে পারবে।

রোগটা কি আসলেই চাঁদের অসুখ? সত্যি সত্যি কি চাঁদের দিকে তাকানোর ফলেই হয়েছে এটা? নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেজন্যেই টেরিদের বাড়িতে এসেছে কিশোর।

টেরির ঘরে ঢুকল। দেখল, মন খারাপ করে জানালার কাছে বসে আছে টেরি আর টাকি।

'কেমন আছো, টেরি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখতেই তো পাচ্ছ!' গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল টেরির।

'একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে এসেছি, টাকি। সেরাতে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে কি কি করেছ তোমরা, কোথায় কোথায় গিয়েছ, সব

খুলে বলো তো। কোন কথা বাদ দেবে না। সামান্যতম কথাও নয়। বলা যায় না, কিসের মধ্যে লুকিয়ে আছে তোমাদের ভাল করার সূত্র!'

আঠারো

সব খুলে বলতে লাগল টেরি আর টাকি।

কোন রকম বাধা না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল কিশোর।

রবিন আর মুসাও চুপচাপ রইল।

ক্যান্ডি খাওয়ার কথায় আসতেই হাত তুলল কিশোর, 'এক মিনিট! কি ক্যান্ডি বললে? বেস্ট? ওরকম কোন ক্যান্ডি কোম্পানির নাম তো শুনিনি!'

'সব কোম্পানির নামই যে শুনবে এমন কোন কথা নেই,' টাকি বলল। 'খেলাম। ভাল লাগল। সেজন্যেই নামটা দেখতে বলেছিল টেরি।'

'সবগুলো খেয়ে ফেলেছিলে?'

'না, আছে বোধহয় এখনও একটা,' দেয়ালের দিকে দেখাল টেরি। তার ট্রিক-অর-ট্রীট ব্যাগটা ঝোলানোই রয়েছে। হ্যালোউইনের রাতে উপহার ভর্তি করে নিয়ে আসার পর যে ভাবে রেখে দিয়েছিল, সেভাবেই আছে। হাত দেয়া আর হয়নি। পরদিন সকালে উঠে বাড়ি ছেড়েই পালাতে হয়েছিল।

তাড়াহুড়ো করে ব্যাগটা নামাতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত উপহার। ক্যান্ডিগুলো ঘাঁটতে শুরু করল সে।

টেরি বলল, 'ওই তো, ওই হলুদ মোড়কটা। ওটাই দিয়েছিল মিসেস জোরোবেল।'

ছোঁ মেরে ক্যান্ডিটা তুলে নিল কিশোর। মোড়কের লেখার দিকে একবার তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। উত্তেজনায় ফেটে পড়তে লাগল। চিৎকার করে ডাকল, 'রবিন! মুসা! দেখে যাও!'

দৌড়ে এল দুই সহকারী গোয়েন্দা। বিচিত্র ভঙ্গিতে শিম্পাঞ্জীর মত লাফাতে লাফাতে টেরি আর টাকিও ছুটে এল।

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'দেখো, লেখাটা...' সবার দেখার জন্যে ক্যান্ডিটা দুই আঙুলে ধরে তুলে ধরল কিশোর।

'কি আর পড়ব,' না তাকিয়েই টাকি বলল, 'বেস্ট বার...'

'না, বেস্ট বার নয়!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ভুলটা এখানেই করেছিলে তোমরা। এতদিন ভুগতেও হয়েছে সেজন্যেই।'

'বেস্ট বার না তো কি?'

'রাতের বেলায় অল্প আলোতে লেখাটা পড়েছিলে তুমি। ভাল করে দেখো এখন।'

'বীস্ট বার!' চিৎকার করে উঠল টেরি।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে টাকি হতভম্ব।

'তাহলে কি দাঁড়াল?' নাটকীয় ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল কিশোর। 'বীস্ট বানান হলো বি-ই-এ-এস-টি।' টাকির দিকে তাকাল। 'অল্প আলোয়, তাড়াহুড়ায় ভালমত না তাকানোতে পেঁচানো "এ" অক্ষরটা চোখ এড়িয়ে গেছে তোমার। পড়েছ বি-ই-এস-টি, বেস্ট।'

টেরির মুখ দেখে মনে হলো এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে টাকির ওপর।

'তারমানে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অসুখটা হয়নি ওদের?' বিড়বিড় করল রবিন।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'মিসেস জোরোবেল প্রতিশোধ নিয়েছে টেরি আর টাকির ওপর। হ্যালোউইনের রাতে উপহার দেবার ছুতোয় ভয়ঙ্কর জিনিস তুলে দিয়েছে ওদের হাতে। আমি এখন শিওর, এই ক্যান্ডির মধ্যেই রয়েছে নেকড়ে-মানব হবার ওষুধ। ল্যাবরেটরি টেস্ট করলেই বেরিয়ে আসবে। ক্যান্ডিগুলো মিসেস জোরোবেলের নিজের তৈরি। ওষুধটাও। কম্পিউটারের প্রিন্টারে মোড়কের লেখা প্রিন্ট করাও কিছু না।'

ঘর কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল টেরি। 'ওই ডাইনীটাকে আমি ছাড়ব না! টাকি, এক্ষুণি চলো! শয়তান বুড়িটাকে...'

হাত তুলল কিশোর, 'শান্ত হও। মাথা গরম কোরো না। এখনও অন্ধকার হয়নি। রাস্তায় বেরোলেই ছেলেমেয়ের দল পিছু নেবে তোমাদের। রাত নামুক। তারপর বেরোব। আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব মিসেস জোরোবেলের বাড়িতে।'

কিন্তু তর সইছে না আর টেরি ও টাকির।

রাত নামার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইল দুজনে।

*

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মিসেস জোরোবেলের বাড়িতে এসে হাজির হলো পাঁচ কিশোর।

বাড়িটা আগের মতই নির্জন মনে হচ্ছে। কোন জানালায় আলো নেই।

বেলপুশ টিপল কিশোর।

দরজা খুলে দিল না কেউ।

থাবা দিতে গিয়ে দেখল, দরজা খোলা। ঠেলা দিতেই ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। ভেতরে অন্ধকার।

হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে বের করে আলো জেলে দিল মুসা।

বার বার মিসেস জোরোবেলের নাম ধরে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না।

হলঘরে ঢুকল ওরা। ঘরটা খালি। কেবল মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। দেখে বোঝা গেল, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে মিসেস জোরোবেল।

টেবিলে সবুজ রঙের কাগজে মোড়ানো কিছু রয়েছে।

এগিয়ে গেল কিশোর। দুটো ক্যান্ডি। নিচে চাপা দেয়া ভাঁজ করা একটা কাগজ। একপাশে রাখা একটা ফুলদানি। তাতে রাখা ফুলগুলো বহু আগেই শুকিয়ে গেছে।

কাঁপা হাতে একটা ক্যান্ডি তুলে নিল কিশোর। লেখাটা পড়ল: কিউয়ার বার।

কিউয়ার, মানে সুস্থ।

কাগজটা তুলে নিল সে। ভাঁজ খুলল। বাকি চারজন ঘিরে এল তাকে, কি লেখা রয়েছে দেখার জন্যে।

ছোট্ট একটা চিঠি।

মিসেস জোরোবেল লিখেছে:

টেরি ও টাকি,
শিক্ষাটা কেমন লাগল?
আর কোনদিন খারাপ আচরণ করবে মানুষের সঙ্গে?
তোমাদের ভাল হবার ওষুধ রেখে গেলাম। –মিসেস জোরোবেল।

***

ইউ.এফ.ও রহস্য
তিন গোয়েন্দা
সেবা প্রকাশনী
সেবা
প্রকাশনী

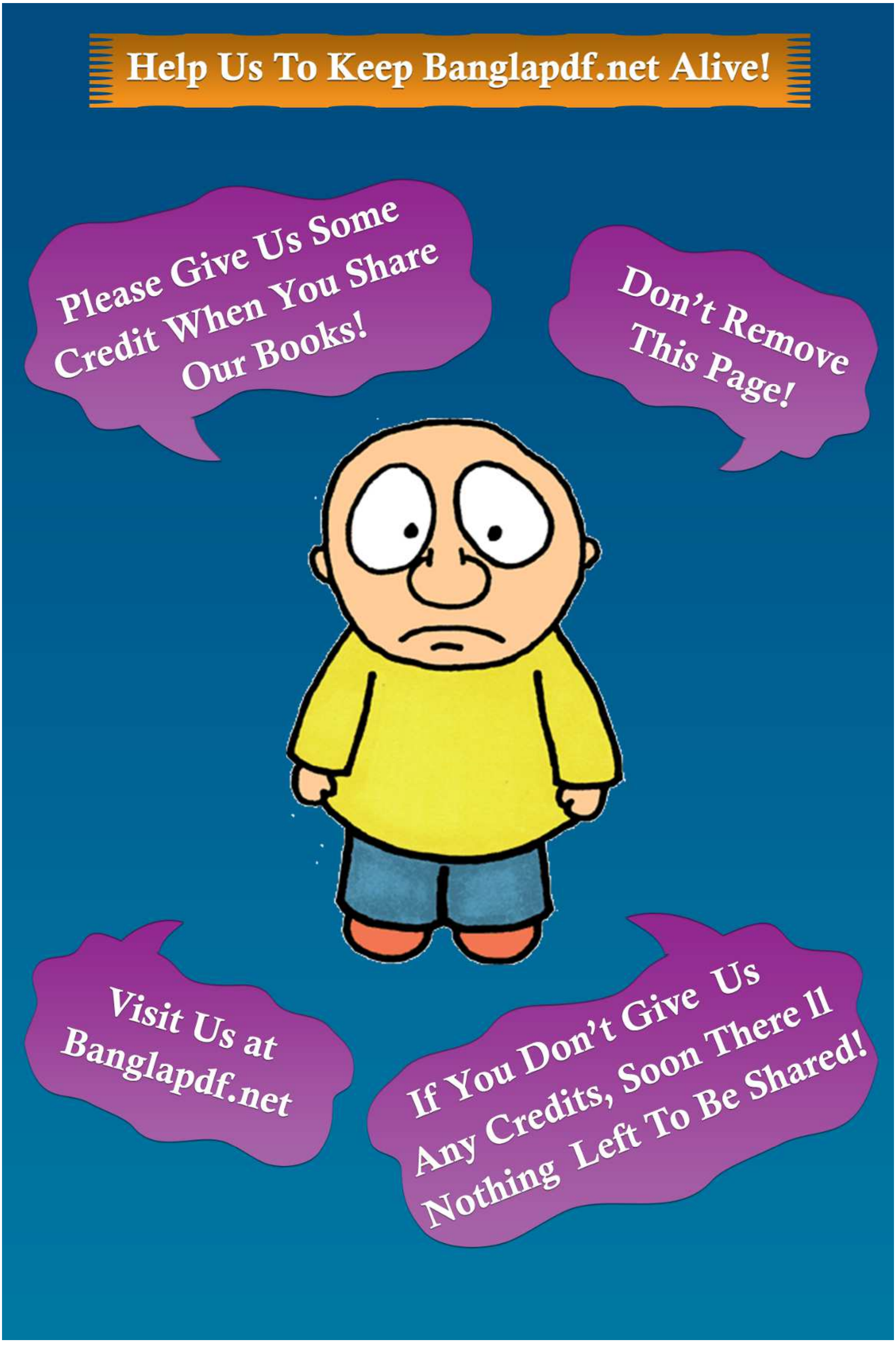
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

(এ-বইটি 'গোয়েন্দা রাজু' সিরিজে 'চকলেট কোম্পানী' নামে ছাপা হয়েছিল। এখন 'তিন গোয়েন্দা' বানিয়ে 'ইউএফও রহস্য' নামে ছাপা হলো। উল্লেখ্য: গোয়েন্দা রাজু সিরিজের লেখক 'আবু সাঈদ' রকিব হাসান-এর ছদ্মনাম।)

ইউএফও রহস্য

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

বিকেল চারটে। বব, মুসা, রবিন, অনিতা, ডলি সবাই এসেছে কিশোরদের বাড়িতে চায়ের দাওয়াতে। বসার ঘরে বসেছে কিশোর আর মিশার সাথে। মিশা মেরিচাচীর বোনের মেয়ে।

টিটুও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

'চা আসছে,' কিশোর জানাল। 'খামোকা বসে না থেকে টিভি দেখি, কী বলো?'

টেলিভিশন খুলে দিল সে। ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল ছবি, নড়েচড়ে ঠিক হয়ে গেল। পর্দায় দেখা গেল সংবাদ পাঠ চলছে, 'বিশেষ সংবাদ পড়ছি।''

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'কী হলো আবার?'

গম্ভীর হয়ে আছে খবর পাঠক। তার মানে ব্যাপারটা সিরিয়াস। বলল, 'গুড আফটারনুন। হয়তো শুনে থাকবেন আপনারা, আজ সকালে ইউ এফ ও দেখার অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়। আমাদের কাছে এইমাত্র খবর এল, ইউ এফ ও, অর্থাৎ আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট দেখা গেছে লস অ্যাঞ্জেলিস শহরের আকাশেও। সারাদিন ধরেই ওগুলো দেখার খবর আসছে সাগর উপকূলসহ আশপাশের বিভিন্ন শহর থেকে।'

ভয় ফুটল মিশার মুখে। 'কেয়ামত কী এসে গেল নাকি?' কণ্ঠস্বরেও ভয়, চাপা দিতে পারল না। পর্দার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না মুহূর্তের জন্য।

'এই আজব ঘটনার খবর সমস্ত খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছে,' পড়ে চলেছে সংবাদ পাঠক। 'সান্ধ্য কাগজগুলো ছেপেছে ফলাও করে। তবে দুঃখের বিষয়, ইউ এফ ওর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি, আর তাই ...'

'একটা পেপার দেখে এসেছি আসার সময়,' রবিন জানাল। 'ভালমত খেয়াল করিনি তখন। শুধু হেডিং দেখলাম, লিখেছে: ইউ এফ ও দেখা গেছে। এমন জানলে পুরোটা পড়েই আসতাম।'

'আমিও দেখেছি,' বব বলল।

'শশশ!' করে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ওদেরকে চুপ করতে ইশারা করল কিশোর। 'দেখি, কী বলে!' টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

কিন্তু আর কোন খবর দিল না সংবাদ পাঠক। বলল, 'নতুন আর কোন খবর পাওয়া গেলে জানাব। খবর আপাতত এখানেই শেষ।'

'পুলিশ কী করবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ইউ এফ ও তাড়া করে বেড়াবে?'

'আর মিলিটারি?' যোগ করল ডলি। 'কেউ কিছু করছে বলে তো মনে হচ্ছে

না! করলে জানতাম।'

'হয়তো ওরাও ভয় পেয়েছে,' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল মিশা, অযথাই আঙুল চালাতে লাগল চুলে। 'আমি শিওর।'

'সব ফাঁকিবাজি,' অনিতা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। এত ভয় পেয়ো না। ওই খবরের কাগজওলারা বাড়িয়ে বলার ওস্তাদ। তিলকে তাল করে ফেলে। বলল যে শুনলে না, ছবি তুলতে পারেনি। কেন পারল না? সব জিনিসের ছবি তোলা গেলে ফ্লাইং সসারের ছবি কেন তোলা যাবে না? ওগুলোও একধরনের মহাকাশযান, আকাশে ওড়ে। এরোপ্লেন আর রকেটের তো ছবি তোলা যায়। আসলে সব শয়তানী। আমি শুনেছি, মাঝে মাঝে আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে থাকে ইউ এফ ও, কোনটা পিরিচের মত, কোনটা ঘোড়ার গাড়ির চাকার মত, আবার কোনটা বা লণ্ঠন উল্টো করে বসিয়ে দিলে যেমন হয়, ওরকম দেখতে। এরকম যদি সত্যিই থাকে, ছবি তোলা যাবে না কেন?'

'অনিতা ঠিকই বলেছে,' একমত হলো কিশোর। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এল টেলিভিশনের সুইচ। 'এখানে চুপচাপ বসে থেকে লাভ নেই। চলো, চা হলো কিনা দেখি। দেরি দেখলে গিয়ে বাগানটা সাফ করে ফেলব। কারও আপত্তি আছে?'

অযথা বসে থাকতে কারোই ভাল লাগবে না। কাজেই কিশোরের পিছে চলল সবাই। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোভনীয় গন্ধ এল নাকে। গরম কেক!

'এই যে, সময়মতই হাজির হয়ে গেছ,' রান্নাঘর থেকে বললেন মেরিচাচী। 'আর অল্প বাকি।'

'আমাদের জন্য বানিয়েছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই। আর কার জন্য?' চাচী বললেন। 'বন্ধুদের দাওয়াত করে এনেছিস। ভাল জিনিস খাওয়াতে হবে না? সব ক'জনেরই তো রুচির খবর জানা আছে আমার। দাঁড়া, কেক কেটে দিচ্ছি। তুই জেলি বের করে রুটিতে মাখ ততক্ষণ। মাখন আর মধুও বের কর।'

বাগানে যাওয়া ঘুচল। ওখানেই টেবিল ঘিরে বসে পড়ল সবাই। গরম গরম চমৎকার কেক। টিটু ভাবল তার কথা ভুলে গেছে সবাই। মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠে সামনের দু'পা তুলে দিল টেবিলের ধারে। লম্বা জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, এর মানে পরিশ্রম নয়, খুব খেতে ইচ্ছে করছে তার।

'লক্ষ্মী ছেলে,' মিশা বলল। 'খালা, ওকেও একটুকরো কেক দিই?'

'কী করে না বলি?' হেসে বললেন চাচী। 'সবাই খাবে, আর ও একা চেয়ে চেয়ে দেখবে? দে, দিয়ে দে একটুকরো।'

চোখের পলকে টুকরোটা শেষ করে আরও চাইল টিটু। দেওয়া হলো। এমনি করে সবার ভাগ থেকেই কিছু কিছু করে দেওয়া হলো তাকে। তারপরেও যখন একেবারে শেষ হয়ে গেল, কিছুই অবিশিষ্ট রইল না, তখনও রান্নাঘর থেকে তাকে বের করে নিয়ে যেতে বেশ অসুবিধে হলো ওদের। সবাই চলল বাগানের ছাউনিতে।

ছাউনিতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এল মিশা। 'বেশ কয়েক হপ্তা ধরে বসে আছি আমরা। একটা কেসও পাইনি।'

'হ্যাঁ, গরমের ছুটির পর থেকেই কিছু পাচ্ছি না। আর বড়দিনের ছুটিতে তো ঘর থেকেই বেরোনো যায় না,' ডলি বলল। 'যা বরফ পড়ে।'

'ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষার পরেও একই অবস্থা থাকবে,' অনিতা বলল। 'সাংঘাতিক ঠাণ্ডা।'

'এখনই ভাল। বসন্তকাল,' হেসে বব বলল। 'ছুটিও আছে পনেরো দিনের। এখন একটা রহস্য-টহস্য পেলে ভালই হত।'

'ফ্লাইং সসার শিকারে বেরিয়ে যাও,' টিপ্পনি কাটল মুসা। 'প্রজাপতি ধরার জাল নেবে সঙ্গে। সসার দেখলেই আটকাবে।'

'বলতে তো সহজই,' কিশোর বলল। 'কিন্তু সামনে পড়লে না বোঝা যায়। যদি তোমার সামনে ইউ এফ ও পড়ে, কী করবে?'

'ইউ এফ ওর গপ্পো বাদ দাও তো,' নাকমুখ কুঁচকে বলল অনিতা। 'বিষয়টা একেবারে পচে গেছে। এত বেশি শুনেছি, এত বেশি দেখেছি টিভিতে, এখন আর ভাল্লাগে না। বাবা বলেঃ সব ফালতু। ওরকম জিনিস নেই।'

হঠাৎ জোরে জোরে তিনবার থাবা পড়ল দরজায়। ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলল কিশোর।

লধশদের গোপন আলোচনা বাইরের কেউ শুনে ফেলুক, এটা চায় না সে। বাইরের কাউকে ভিতরে আনতেও নারাজ। সবাই চুপ হয়ে গেল। এমনকী টিটুও নীরব হয়ে কান খাড়া করল।

আবার তিনবার থাবা পড়ল দরজায়।

'কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমরা!' বলল একটা ভীত কণ্ঠ।

'মরেছে!' বলে উঠল মুসা। 'বাবলি!' বাবলি ওর চাচাত বোন। 'আর ওর মতই আরেকটা শয়তান, ওর বান্ধবী নিনা। সাহস তো কম না, আমাদের ছাউনিতে ঢুকতে চায়!'

'প্লীজ!' অনুনয় করে বলল বাবলি। 'দরজাটা খোলো, প্লীজ!'

'খোলা হবে না,' কড়া গলায় বলল কিশোর। 'তোমরা লধশের কেউ নও। ভাল করেই জানো বাইরের কাউকে ছাউনিতে ঢুকতে দিই না আমরা। আর তোমাদেরকে দেয়ার তো কথাই ওঠে না।'

'দোহাই তোমাদের!' ফুঁপিয়ে উঠল নিনা। সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে মনে হয়, অভিনয় নয়।

'হয়েছে, হয়েছে, আর বোকা বানাতে হবে না আমাদের,' ধমক দিয়ে বলল মুসা। বাবলি আর তার বন্ধুদের কখনও বিশ্বাস করে না সে। সব সময় একটা না একটা শয়তানীর তালে থাকে ওরা।

'বাবলির মাথা ঘুরছে!' নিনা বলল। 'আল্লার কসম। মিথ্যে বলছি না। সাহায্য দরকার আমাদের।'

'ওর কথায় ভুলো না!' ফিসফিস করে বলল অনিতা। 'দরজা খুললেই দেখবে

হো-হো করে হেসে উঠবে।'

'ওসব কথায় চিড়ে ভিজবে না,' মুসা বলল। 'অন্য কথা বলো।'

সাড়া এল না আর বাইরে থেকে। অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে লধশেরা। বোঝার চেষ্টা করছে বাইরে হচ্ছেটা কী।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল টিটু। দরজাটার হুড়কো খোলার চেষ্টা করতে লাগল। থামতে বলল ওকে কিশোর। থামল না দেখে ধমক লাগাল, 'এই থামবি! না মারব কষে এক চড়!'

সরে এল টিটু।

বাইরে কোন শব্দ নেই।

শেষে আর থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে বাবলি আর নিনা। গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছে।

'এইমাত্র দেখে এলাম একটা!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল নিনা। 'তাই না রে, বাবলি! জোরে জোরে শিস দিল···আর কী ধোঁয়া!···আর···'

'কীসের ধোঁয়া?' বাবলিকে টেনে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কীসে শিস দিল? কী দেখেছ তোমরা?'

ঠোঁট কাঁপছে নিনার। এক এক করে চোখ বোলাল লধশদের উপর। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না ওরা এখানে রয়েছে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'সসার! একটা ফ্লাইং সসার দেখেছি!'

বলেই আবার ফোঁপাতে শুরু করল।

এই অবস্থা কেন নিনার! ওর জন্য এখন খারাপই লাগল ডলি আর অনিতার। বাবলির জন্যও। ধরে ধরে ওদেরকে ছাউনিতে নিয়ে এল লধশরা। বসতে দিল। তারপর লেমোনেড এনে দিল খাওয়ার জন্য।

'সব ফাঁকিবাজি!' এখনও সন্দেহ যাচ্ছে না মুসার। 'ভালই বোকা বানিয়েছে আমাদের। খাতির করে এনে ঘরে বসিয়ে খাওয়ালাম। এখুনি হো-হো করে হেসে উঠবে, দেখো।'

'না-না,' লেমোনেড খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে বাবলি। 'ওরকম সাংঘাতিক জিনিস জীবনে দেখিনি! আরিব্বাবারে···' কথার মাঝখানেই থেমে গেল সে। কী যেন ভাবছে! এক এক করে আবার তাকাল লধশদের দিকে। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'ফ্লাইং সসার!' কানে আঙুল দিল। 'ইস, কী তীক্ষ্ণ শিস! আর ধোঁয়া! এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি!'

'নীল ধোঁয়া!' নিনা বলল।

'লাল ধোঁয়া!' বাবলি বলল।

'না, নীল। প্রথমে নীল, তারপর সবুজ, তারপর লাল হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' এইবার একমত হলো বাবলি।

'এই, শুনো না ওদের কথা!' মুসা বলল। 'বিশ্বাস কোরো না! সব বানিয়ে বলছে। ধোঁয়ার ব্যাপারেই একেকবার একেক কথা বলছে। দেখে থাকলে কী ওরকম করত নাকি?'

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ায় দু'জনের পকেট হাতড়াতে শুরু করল রবিন।

'কী খুঁজছ? বব জিজ্ঞেস করল।

'পেঁয়াজ,' শান্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'চোখে পানি দেখলে না। পেঁয়াজের রস দিয়ে কেঁদেছে কিনা দেখছি।'

কিন্তু নিনা বা বাবলি কারও পকেটেই পেঁয়াজ পাওয়া গেল না। তখন ওদের হাত শুঁকে দেখল বব। না, হাতেও গন্ধ নেই। ভুল করেছে, মেনে নিতে বাধ্য হলো। 'না, চোখের পানিটা বোধহয় আসলই।'

'এক মিনিট!' হাত তুলল মুসা। বোনের পাশে এসে দাঁড়াল। আঙুলের আগা দিয়ে গালের পানি মুছে দেখে বলল, 'না, গ্লিসারিনও নয়।' বড় হতাশ হয়েছে। 'একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, অভিনেতারা গ্লিসারিন ব্যবহার করে। গালে লাগিয়ে নেয়। ছবিতে দেখে মনে হয় কাঁদছে। গ্লিসারিন পানির মত শুকিয়ে যায় না...'

'আমাদের বিশ্বাস করছে না ওরা!' নিনার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল বাবলি।

'কিন্তু সত্যি বলছি আমরা!' সবার দিকে তাকিয়ে বলল নিনা। 'বানিয়ে বলিনি। খবরের কাগজেও দেখেছি...'

'হ্যাঁ, এবার বোঝা গেল,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'ওটা দেখেই একটা গল্প ফেঁদে এসে শোনাচ্ছে আমাদের। তা কাঁদার অভিনয়টা করলে কীভাবে?'

দুঃখে ক্ষোভে আবার কাঁদতে আরম্ভ করল বাবলি। ওরা আসার পর থেকে মিশা কিছুই বলেনি। এখন এগিয়ে এল। 'মনে হয় সত্যি কথাই বলছে ওরা।' সামান্য কেঁপে উঠল তার গলা। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি নিয়ে তাকাল লধশের অন্য সদস্যদের দিকে। 'আসলে আমাদের অহঙ্কার খুব বেশি হয়ে গেছে। তাই নিজেদেরকে ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবতে পারি না। ভাবি না, আমরা ছাড়াও রহস্যভেদ করতে পারে আরও অনেকে, সাহসের কাজ করতে পারে। স্বীকার করছি, বাবলি আমাদেরকে অনেক ঠকিয়েছে, কিন্তু ওর বুদ্ধি আছে, সাহসও আছে, বুদ্ধি আর সাহসের জোরেই আমাদের ঠকিয়েছে—একথা তো মানবে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ। মিশার কথায় ভুল বুঝতে পেরে নিজেদেরকে খুব ছোট লাগছে এখন। সত্যিই তো বলেছে মিশা। ওরা তো তাই ভাবছিল, ওরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ কোন রহস্য পেতে পারে না, সেটা ভেদ করতে পারে না, দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে পারে না। অহঙ্কার সত্যিই বেশি হয়ে গেছে ওদের। ওদের ধারণা ছিল, ফ্লাইং সসার দেখতে হলে ওরাই আগে দেখবে, বাবলি আর নিনা কেন?

দীর্ঘ নীরবতা। অবাক হলো টিটু। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না সে। এই চুপ করে থাকা আর ভাল লাগল না ওর। কিছু একটা করা দরকার।। লাফালাফি করার আগে একবার চেঁচিয়ে নিলে কেমন হয়? সেটাই ভাল মনে করল সে। ঘেউ ঘেউ করে উঠল গলা ফাটিয়ে।

অস্বস্তিকর পরিবেশ অনেকটা সহজ করে দিল সে।

আবার কথা বলতে শুরু করল সবাই।

'কোথায় দেখেছ?' বাবলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ডলি।
'অনেকক্ষণ হয়েছে?' বব জানতে চাইল।
'জিনিসটা কি খুব বড়?' রবিনের প্রশ্ন।
এতক্ষণ বিশ্বাস করেনি। এখন যেই করেছে, নানারকম প্রশ্ন ভিড় করে এল সবার মনে। একসাথে প্রশ্ন শুরু করল নিনা আর বাবলিকে।

দুই

অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঢং-ঢং করে আটটা বাজল গির্জার ঘড়িতে। সবার বাড়ি থেকেই অনুমতি মিলল, রাতের খাবারের পর বাইরে বেরোতে পারবে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে অবশ্য অনুমতি মিলত না। গত বিশটি মিনিট পাহাড়ী এলাকায় খুঁজে বেড়িয়েছে ওরা, টরলিং ক্যাসলের ধ্বংসস্তূপে যাওয়ার পথটার আশেপাশে।

লধশদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে নিনা আর বাবলি। পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে আগে আগে এগিয়ে চলেছে ওরা। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে। ব্যাপারটা বুঝেই হয়তো ওদেরকে সাহস জোগানোর জন্য আগে চলে গেল টিটু। কথা খুব কম বলছে সবাই। মাঝে মাঝে কোন দিকে যেতে হবে জানতে চাইছে কিশোর।

মাথা ঝাঁকিয়ে কিংবা দু'এক কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছে নিনা বা বাবলি, কোনদিকে যেতে হবে।

পাহাড়ের উপর উঠছে ওরা। অন্ধকার বাড়ছে। একটু পরেই ফার গাছের ছোট একটা জঙ্গলে এসে ঢুকল। সাঁঝের এই আবছা অন্ধকারে কেমন যেন অদ্ভুত, বিষণ্ন লাগছে জায়গাটা। পুব আকাশে উঁকি দিল চাঁদ, ম্লান আলো ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশটাকে আরও ভূতুড়ে, আরও রহস্যময় করে তুলল। গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে।

'বাপরে!' কেঁপে উঠল ডলি। 'গা ছমছম করছে!'

একটা ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খচমচ শব্দ শোনা গেল। থমকে দাঁড়াল ওরা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিনা।

তারপর সবার বুক কাঁপিয়ে দিয়ে ঝোপের ভিতর ফড়ফড় করে উঠল কী যেন। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল বিশাল এক হুতোম পেঁচা। হলুদ চোখ পাকিয়ে নিঃশব্দে সবাইকে একবার কড়া ধমক লাগিয়ে উড়ে চলে গেল মাথার উপর দিয়ে।

'আর এক পা-ও এগোচ্ছি না আমি!' ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বাবলি।

'আমি বাড়ি যাব!' ফিসফিসিয়ে বলল নিনা। কাঁপছে।

'কিন্তু আমাদেরকে জায়গাটা দেখাবে বলে নিয়ে এসেছ,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'এতদূর কষ্ট করে এসে শেষে একটা পেঁচার ভয়ে ফিরে যাব?'

'আমাদেরকে ছাড়াই যেতে হবে তাহলে,' বাবলি বলল।

'তা ছাড়া বেশি দূরেও না,' নিনা বলল। 'এসে গেছি।' নখ কামড়াল একবার। তারপর হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে ঝোপের মাঝখানে গাছগুলো বেড়ে

উঠেছে দেখছ? ওখানে...' থেমে গেল সে। যেন ভয় পাচ্ছে, আবার এসে হাজির হবে আজব জিনিসটা।

'ওখানেই?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল বাবলি।

'চলো সবাই!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা।

'আমরাও?' কেঁদে ফেলবে যেন নিনা।

'ঠিক আছে,' ডলি বলল, 'আমি তোমাদের সাথে থাকছি।'

'হ্যাঁ। মিশা, তুমি আর অনিতাও থাকো,' কিশোর বলল। 'বব, কিছু যদি মনে না করো, তুমিও। তোমার শরীর খারাপ। তা ছাড়া মেয়েদের পাহারা দেয়া...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, থাকছি,' হাত তুলল বব। বলল বটে, কিন্তু এখানে থাকতে মোটেও ভাল লাগছে না তার। সারাটা শীতকাল ধরে শরীর ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার বলেছেন, হাঁপানীর লক্ষণ। কাজেই কিছুদিনের জন্য বেশি কায়িক পরিশ্রম বন্ধ। মন খারাপ হয়ে গেল। ইস্, কবে যে এই অসুখটা ভাল হবে! ইতিমধ্যেই দুর্বল বোধ করতে আরম্ভ করেছে সে। এখন যদি কিছু ঘটে, যদি তার সামনে এসে নামে ফ্লাইং সসার, বন্ধুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে পালাতে পারবে না। থাক, এখানেই থাকি, এইই ভাল, মনকে বোঝাল সে।

'হুঁশিয়ার থেকো!' যারা যাচ্ছে তাদেরকে সতর্ক করল মিশা।

'থাকব,' কথা দিল রবিন। 'তা ছাড়া টিটু থাকছে আমাদের সাথে। ভয় কী?' সাহস দেখিয়ে বলল বটে, কিন্তু গলায় তেমন জোর নেই।

টিটুকে নিয়ে আগে আগে চলল কিশোর। ঠিক তার পেছনেই রইল মুসা আর রবিন। ঝোপ আর গাছপালাগুলোর দিকে। ঝোপের ঠিক মধ্যিখানে গজিয়ে উঠেছে তিনটে গাছ। ওখানেই সসার দেখা গেছে।

ঝোপের কিনারে পৌঁছে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিনজনে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল টিটুও, দুই পায়ের ফাঁকে থুতনি।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইল ওরা। কোথাও কিছু নড়ছে না, শব্দ নেই, শুধু মৃদু বাতাসে গাছের পাতার সড়-সড় ছাড়া।

'আয়!' ফিসফিস করে টিটুকে বলল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল গাছ তিনটের দিকে। তাকে অনুসরণ করল অন্য দু'জন। পাশে পাশে নিঃশব্দে হেঁটে চলল টিটু।

খুব সাবধানে গাছের কাছাকাছি পৌঁছে থামল ওরা। কোন শব্দ করছে না। যদি কিছু থাকে সত্যি, আওয়াজ শুনে চলে যায়, এই ভয়ে। ইশারায় কথাবার্তা চালাল ওরা। ইঙ্গিতে ঝোপের দিকে দেখিয়ে বুড়ো আঙুল তুলে নাড়ল রবিন। অর্থাৎ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত নেড়ে কিশোর বুঝিয়ে দিল, সব কিছু ঠিকঠাকই আছে, গোলমাল চোখে পড়ছে না। গাছের দিকে ইঙ্গিত করে মাথা ঝাঁকিয়ে মুসা বোঝাল আরও সামনে এগোনো দরকার।

লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে বান মাছের মত শরীর মুচড়ে মুচড়ে যেন পিছলে এগোল তিন গোয়েন্দা। টিটু আঁচ করে ফেলেছে, বিপদ হতে পারে, তাই চুপ করে রয়েছে। হাঁপাচ্ছে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

এবারও আগেই রইল কিশোর। আস্তে করে ঘাস ফাঁক করে মাথা ঢোকাচ্ছে। হাত মাটিতে রাখার আগে দেখে নিচ্ছে শুকনো ডালপালা রয়েছে কিনা। উত্তেজনায় ঘামছে। বিপদ দেখলেই ছুটে পালানোর জন্য টানটান হয়ে আছে স্নায়ু।

আর মাত্র একটুখানি পথ বাকি, তারপরেই পৌঁছে যাবে বাবলি আর নিনার দেখানো জায়গাটায়। যেখানে ফ্লাইং সসার নামতে দেখেছে ওরা।

জায়গাটা দেখা গেল অবশেষে। তিনটে গাছের ওপাশে শুধু ঘাস।

'চলে গেছে!' বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

মুসা আর রবিন এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'চিহ্নও নেই,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।

'না থাকারই কথা,' মুসা বলল। 'কারণ ফ্লাইং সসার বলে আসলে কিছু নেই। শয়তানটা আবার বোকা বানিয়েছে আমাদের। বাড়ি গিয়ে আজ ওর পিঠের ছাল না তুলেছি তো...!'

'টিটু, যা ওদের গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়,' আদেশ দিল কিশোর। 'যা, জলদি যা।'

বিদ্যুতের মত ছুটে গেল টিটু। অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে ওর ঘেউ ঘেউ।

হঠাৎ মনে পড়ল রবিনের, সাথে টর্চ আছে। পকেট থেকে বের করে জ্বালল সেটা। এখানে আসতে আর কোন অসুবিধা হবে না বাবলিদের। টর্চের আলোই পথ দেখাবে।

মিনিটখানেক পরেই এসে হাজির হলো ওরা।

'মিথ্যে কথা বলেছে,' ববকে জানাল মুসা। খুব রেগেছে। 'আজ এখানেই ফেলে যাবে ওদের। সারারাত এই জঙ্গলের মধ্যে থাকলে উচিত শিক্ষা হবে, জীবনে আর এরকম শয়তানী করবে না।'

'না! না!' আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠল বাবলি।

'আল্লাহর কসম, ফ্লাইং সসার দেখেছি আমরা!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল নিনা।

'প্রমাণ করো!' গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' বাবলির সামনে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'প্রমাণ করো! ফ্লাইং সসার নেমে থাকলে মাটিতে দাগ নেই কেন?'

'আমি জানি না... বুঝতে পারছি না!' ফুঁপিয়ে উঠল বাবলি।

'দুটোই ডাহা মিথ্যুক,' ঝাঁঝাল গলায় বলল অনিতা। 'দয়া করে বলো তো এখন...'

হুইইইইই করে বাতাস কাটার শব্দ উঠল। অন্ধকার চিরে দিল যেন তীক্ষ্ণ শিস। হঠাৎ উজ্জ্বল লাল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল পুরো পাহাড়।

'সসার!' আকাশের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ডলি।

হাঁ হয়ে গেছে মুখ। পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার সঙ্গীরাও। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে আজব বস্তুটার দিকে।

উজ্জ্বল আলোর একটা চাকতি, বড় জোর পঞ্চাশ মিটার দূরে, ধীরে ধীরে

নেমে আসছে। চারপাশ ঘিরে ঘুরছে লাল ধোঁয়ার একটা চক্র।

ব্যাপার কী কিছুই বুঝতে না পেরে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে টিটু, অন্যেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ।

মাটি থেকে দশ মিটার উঁচুতে থেমে গেল সসার। তারপর ঘটল আরও আজব ঘটনা। রঙ বদলাচ্ছে ধোঁয়ার চক্র।

লাল থেকে কড়া লাল, ফ্যাকাসে লাল, তারপর বেগুনী, এবং সবশেষে নীল হয়ে গেল। তারপর আবার নামতে শুরু করল সসার। মসৃণ ভঙ্গিতে নামল মাটিতে। মাথার উপরে দপ করে জ্বলে উঠল একটা আলো, ঘুরতে শুরু করল সার্চ লাইটের মত, যেন ঘুরে ঘুরে দেখছে চারপাশের দৃশ্য।

নিজেদের উপর দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময় মাটিতে ঝাঁপ দিল বাবলি আর নিনা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

যেন ওদের চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়েই মাটি থেকে উঠতে শুরু করল আবার ফ্লাইং সসার। উঠছে ধীরে ধীরে, বাড়ছে শিসের শব্দ। কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। কানে আঙুল দিল কিশোর আর তার সহকারীরা।

একশো মিটার মত উঠে চলতে শুরু করল ফ্লাইং সসার। মাটির সমান্তরালে থেকে ছুটল তীব্র গতিতে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল।

আবার অন্ধকার আর নীরব হয়ে গেল আশপাশটা।

কয়েক মিনিট একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সবাই। আকাশের দিকে চোখ। বাবলি আর নিনা ঘাসের উপর পড়ে আছে। একটুও নড়ছে না।

সবার মাঝে আবার প্রাণের সঞ্চার করল টিটু। একেকজনের কাছে ছুটে গিয়ে হাত চেটে দিচ্ছে, হাঁটু চাটছে। লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, সবাইকে সচল করার চেষ্টায়। তারপরেও যখন নিথর দাঁড়িয়ে রইল ওরা, ব্যাপার সুবিধের লাগল না তার। আর কী করা দরকার বুঝতে পারল না।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে সবার আগে সামলে নিল কিশোর। 'চলো, বাড়ি যাই।'

'এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়,' মুসা বলল।

বাবলি আর নিনার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল ডলি। 'এই, ওঠো। এখানে রাত কাটাতে পারবে না।'

সে আর অনিতা মিলে টেনে তুলল দু'জনকে।

মিশার দিকে তাকাল কিশোর। ভয় তাড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মিশা। এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল সে।

'বাড়ি যাব আমি!' গলা কাঁপছে মিশার। 'বাড়ি যাব!'

'তাই তো যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব। এই, চলো সবাই।'

সেরাতে ঘুমানো কঠিন হলো ওদের জন্য। সারাক্ষণ চোখের সামনে ভাসছে আজব দৃশ্যটা। তারপর, মাঝরাতে এল ভয়াবহ ঝড়। ভীষণ শব্দে বাজ পড়তে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘনঘন, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলল ঝড়ের তাণ্ডব। এই আওয়াজের মাঝে ঘুমানো মুশকিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা কথাই ভাবছে লধশরা, ফ্লাইং সসারটার ব্যাপারে আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে?

তিন

পরদিন বিকেলে কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে মিটিং ডাকা হলো লধশদের।

দরজায় টোকা দিয়ে নতুন সঙ্কেত বলল ডলি, 'ইউ এফ ও।'

দরজা খুলে দিয়ে কিশোর বলল, 'আজও দেরি করলে।' ডলি ঢুকলে দরজা লাগিয়ে দিল আবার সে।

'হ্যাঁ, হয়ে গেল,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল ডলি। একটা বাক্সের উপর বসল। তার একপাশে মিশা, আরেক পাশে অনিতা। উল্টোদিকে বসেছে ছেলেরা। ওদের পাশে লম্বা হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে টিটু।

'শুরু করা যাক এবার,' কিশোর বলল। 'অনেক ভেবে দেখলাম,' বলে সবার উপর একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল সে। 'সসার দেখার কথাটা কাউকে জানাব না। এ-নিয়ে কারও সামনে আলোচনা করব না। গোপন রাখতে হবে। টপ সিক্রেট, বুঝেছ?'

'বুঝেছি!' একযোগে বলল সবাই।

'বাবলি আর নিনার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'নাকি ওদের কথা ভুলেই গেছ?'

'না, ভুলিনি। ওরা একটা সমস্যা। সব দেখেছে,' কিশোর বলল।

'ওদের কপাল ভাল, আমরাও দেখেছি,' ডলি বলল। 'নইলে কে বিশ্বাস করত?'

আগের রাতের কথা ভেবে কেঁপে উঠল মিশা। এই কেসটা পছন্দ হচ্ছে না তার। কিছু না দেখলেই যেন ভাল হত!

'কিন্তু ওদেরকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারব না,' রবিন বলল। 'এত্ত ভীতু। ওদের সামলাব না কাজ করব?'

'তা বটে,' বলল অনিতা। 'কিন্তু ওদেরকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে গেলে সবাইকে বলে দেবে ওরা।'

'হুঁ,' কিশোর বলল। 'ওদেরকে আমরা ভাগিয়ে দিলে চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেনে যাবে সারা শহরের লোকে।'

'তা হলে কী করতে বলো?' মিশার প্রশ্ন।

'ওরাও এই কেসে কাজ করবে আমাদের সঙ্গে। এছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

'বলো কী, কিশোর?' চোখ কপালে উঠে গেল রবিনের। 'বাবলি আর নিনাকে যোগ করবে লধশের সঙ্গে?'

'ওদেরকে নিলে আমি লধশে নেই,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। 'আমার বদলে যদি বাবলিকে নিতে চাও, নাও।'

'শোনো, বোঝার চেষ্টা করো,' কিশোর বলল।

'কিন্তু ওদেরকে নেয়া যায় না, কিশোর,' বব বলল। 'এটা লধশের নিয়মের বাইরে।'

'বেশ,' হাত তুলল কিশোর। 'এরচেয়ে ভাল কিছু যদি কেউ বলতে পারো, বলো, আমি বাবলিকে নিতে বলব না আর।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। আর কোন উপায় বের করতে পারল না কেউ। ওদের এই নীরব হয়ে যাওয়া দেখে উদ্বিগ্ন হলো টিটু। চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগল সবার মুখের দিকে।

'বেশ, নিতেই যদি হয়,' অবশেষে ডলি বলল, 'তা হলে শুধু এই কেসের জন্য। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, এরপরও যদি লধশে থাকে ওরা, আমি থাকব না।'

'আমারও একই কথা,' বলল অনিতা।

'আর আমি এই কেস থেকেই বাদ,' মুসা বলল, 'যদি একটু শয়তানী করে ওই বাঁদর দুটো।'

'তাই যেয়ো,' অধৈর্য হয়ে উঠছে কিশোর। 'আর কারও কিছু বলার আছে?'

কেউ কিছু বলল না।

'বেশ,' কিশোর বলল আবার, 'তা হলে ওই কথাই রইল। এই একটা কেসে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছে বাবলি আর নিনা। এরপর থেকে লধশে ওদের আর কোন স্থান থাকবে না। ওদেরকে এখন খবরটা জানাতে হয় গিয়ে। কে যেতে চাও?'

'আমি,' উঠে দাঁড়াল মিশা।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হলো না তাকে। দরজা খুলেই দেখতে পেল বেড়ার গায়ে কান ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাদেরকে খবর দিতে চলেছিল তারা।

'আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বলেছিলাম না! শয়তানী করবেই। জ্বালিয়ে মারবে। এই কেস আর আমাদের শেষ হবে না কোনদিন।'

'তাই নাকি?' মুখ ভেঙচাল বাবলি। আগের দিন সন্ধ্যার ভয়কাতুরে মেয়ে আর নয় এখন, আবার পুরানো রূপ ধরেছে। পিত্তি জ্বালিয়ে দিল মুসার। 'শেষ করার জন্য এখন তো তা-ও একটা কেস পেলে, আমরা থাকাতে। নইলে এই ছুটি ঘরে বসেই কাটাতে হত।'

'এখন আমাদেরকে তোমাদের দলে নিতেই হবে,' ভুরু নাচিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল নিনা, 'নইলে সবাইকে গিয়ে বলে দেব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। 'এসো, ভেতরে এসো।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ল বাবলি আর নিনা। ঘরের ভিতরে কী আছে না আছে দেখতে লাগল মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। 'হুঁ, খারাপ না,' যেন সমালোচনা করার জন্য ডাকা হয়েছে তাকে, এমন ভাব করে বলল বাবলি। সাবধানে বসল একটা কমলার বাক্সের উপর, যেন ভয় পাচ্ছে ভেঙে পড়তে পারে।

'খারাপ না কী বলছ?' মুখ বাঁকাল নিনা। 'বলো, পচা। চেয়ার টেবিলের

বদলে বাক্স। আহা, আসবাবের কী ছিরি!'

কোণের একটা তাকের দিকে তাকিয়ে বাবলি বলল, 'বিচ্ছিরি! একটু সাফটাফ করে রাখতে পারো না? মাকড়সার জাল জমে রয়েছে।'

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'থামতে বলবে ওদের! আমি কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছি!'

'যাও না,' বাবলি বলল। 'কে থাকতে বলেছে তোমাকে?'

'এই কিশোর,' রাগে কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গেছে মুসার। 'থামতে বলো! নইলে গলা টিপে ধরব...'

'এই থামবে!' বাবলির দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল কিশোর। 'নইলে সত্যি সত্যি বের করে দেব কিন্তু!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল বাবলি। মুখ বাঁকাল শুধু। তবে আর কিছু বলল না।

একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এক বোতল লেমোনেড তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলল মুসা। শান্ত করার চেষ্টা করছে নিজেকে।

'এত রেগে যাওয়ার কী হলো, মুসা?' বকা দিল কিশোর। 'এভাবে যদি নিজেরা নিজেরা লেগে থাকি, রহস্যের সমাধান আর করতে পারব না। আর বাবলি, নিনা, শোনো, যদি মনে করে থাকো এভাবে সারাক্ষণ শুধু ঝামেলাই পাকাবে তোমরা, তাহলে চলে যেতে পারো।'

'তাই নাকি?' টিটকারি দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল নিনা। 'গিয়ে তা হলে বলে দেব সবাইকে?'

'যাও, বলো,' হঠাৎ রেগে গেল শান্ত স্বভাবের রবিন। 'কী বলবে? ফ্লাইং সসার দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' বাবলি বলল।

'বেশ, বলো গিয়ে। কে বিশ্বাস করবে তোমাদের কথা? তোমরা যে নাম্বার ওয়ান মিথ্যুক, সবাই জানে। দলে নিয়েছি দয়া করে, ভদ্রভাবে থাকলে থাকো, নইলে বেরিয়ে যাও। মনে রেখো, আমাদের আটজনের বিরুদ্ধে তোমরা মাত্র দু'জন, কিচ্ছু করতে পারবে না।'

চুপ হয়ে গেল বাবলি আর নিনা। রবিনের কথার সত্যতা বুঝতে পেরেছে। একমুহূর্ত ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ল বাক্সের উপর, পরাজিত।

'বসার দরকার নেই,' বলে উঠল কিশোর, 'যদি আমাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে থাকে। টরলিং ক্যাসলের দিকে যাব আমরা। ফ্লাইং সসারের পাহাড়ে।'

চার

আধ ঘণ্টা পর, টরলিং ক্যাসলে ওঠার পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগল লধশরা। অবশ্যই সঙ্গে রয়েছে বাবলি আর নিনা। আজ দিনের বেলায় ফ্লাইং সসারের ভয়

আর অতটা নেই ওদের। তবু নেহাতই ভদ্রতা করে ওদের দুজনের সাথে টিটুকে থাকতে দিল কিশোর। যাতে কিছুটা ভরসা পায় ওরা।

আগের সন্ধ্যায় যেখানে ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল সোজা সেখানে চলে এল ওরা। সেই তিনটে ফার গাছের কাছে এসে আর এগোতে সাহস করল না নিনা ও বাবলি, জানিয়ে দিল সেকথা।

অন্যদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। গাছগুলো পেরিয়ে এসে থামল। 'এই যে, এটাই জায়গা।'

'সসার দেখেছিলাম ওদিকে,' বাঁয়ে দেখাল রবিন। কয়েকটা বড় বড় ঝোপ দেখিয়ে বলল, 'ওগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে নেমেছিল।'

'তাই?' অনিতা বলল। 'আমার যেন মনে হচ্ছে আরেকটু এদিকে?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' একমত হলো বব।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আমার পরিষ্কার মনে আছে, ঝোপগুলো দুলে উঠেছিল। ওগুলোর কাছ থেকে উড়েছিল সসারটা।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না,' পেছন থেকে বলে উঠল নিনা। সাহস করে পায়ে পায়ে পিছে এসে দাঁড়িয়েছে। 'ঝোপ নড়ে উঠলেই যে...'

'অ্যাই, তুমি চুপ!' রেগে উঠল মুসা।

'আহ্, থাম তো!' ধমক লাগাল কিশোর। 'তর্ক করার দরকার নেই। খুঁজে দেখলেই বোঝা যাবে। নেমে যে ছিল, সেটা তো নিজের চোখে দেখেছি। মাটিতে দাগটাগ নিশ্চয় পড়েছে।'

যেখানে নেমেছে সন্দেহ করা হচ্ছে, তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা খুঁটিয়ে দেখতে বলল কিশোর।

'নাহ্, শুধু ঘাস!' মিনিটখানেক পরেই হাল ছেড়ে দিল বাবলি। 'ঘাস ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

'ধরলাম আর ছাড়লাম, এত সহজেই তদন্ত হয়ে যায় নাকি?' বলল মুসা। 'গোয়েন্দাগিরি অত সহজ না। দলে তো এসেছ, এখন বুঝতে পারবে। অনেক ধৈর্য দরকার। মাথা খাটানোর ক্ষমতা দরকার...'

'তোমাকে লেকচার মারতে কে বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠল বাবলি। 'এঁহ, এক্কেবারে কলেজের প্রফেসর...'

'চুপ করো!' বাবলিকে ধমক দিল কিশোর।

'আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? এবার কি আমি শুরু করেছিলাম নাকি? ও-ই তো করল...'

'ইস্, জ্বালিয়ে মারল দেখছি!' বিরক্ত হয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'দেখো মুসা, তুমিও বাড়াবাড়ি কম করছ না। তুমি লধশের স্থায়ী সদস্য, তোমার আরেকটু ভদ্র হওয়া উচিত।'

চুপ করে রইল মুসা। রাগ দমানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে আরও বেশি রেগে গেল সে। বাবলির ব্যাপারটা উল্টো। সে মনে মনে খুশি। কোনমতে এখন কিশোরের সঙ্গে মুসাকে লাগিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। লধশে ভাঙন ধরবে। আর সেটাই চায় সে।

তবে সেটা করতে পারল না, কারণ কিছু বলল না মুসা। নীরবে সসার নামার চিহ্ন খুঁজতে শুরু করল আবার।

খুঁজছে সবাই। কেউ ঝুঁকে, কেউ মাটিতে বসে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে। কেউ বা একেবারে শুয়েই পড়েছে ঘাসের উপর।

খোঁজার ব্যাপারে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে মিশা। প্রতিটি ঘাসের ডগা আঙুল দিয়ে নেড়ে নেড়ে দেখছে সে, কোনটা ভেঙেছে কিনা।

কিন্তু এত নিখুঁতভাবে খোঁজার পরেও কয়েক মিনিট কারও চোখেই কিছু পড়ল না। সবারই মনে হতে লাগল, কোন চিহ্ন রেখে যায়নি ইউ এফ ও।

তারপর, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বব।

সবাই ভাবল, কিছু বুঝি খুঁজে পেল সে। তাড়াতাড়ি ছুটে এল। কিন্তু নিরাশ করল বব। একটা খরগোশের গর্ত দেখিয়ে বলল, 'গর্তের বাইরে মাথা বের করে রেখেছিল খরগোশটা! গায়ের রঙ বাদামী, অথচ কান সাদা!' বুনো জানোয়ার ভালবাসে সে। বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে ওসব দেখে।

না হেসে পারল না কিশোর। 'ভিনগ্রহের খরগোশ নয় তো?' মজা করার জন্য বলল সে। 'ই. টি. খরগোশ।'

'কী জানি, জিজ্ঞেস তো করলাম না!' কিশোরের রসিকতা বুঝতে পারেনি বব।

'এই, এখানে কী করছ তোমরা?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কর্কশ ভারি কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল কিশোর। ঘুরেই স্থির হয়ে গেল।

পাঁচজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিন্দুমাত্র শব্দ হয়নি। লম্বা। চেহারা দেখলেই ভয় লাগে। অপারেশনের আগে ডাক্তাররা যেরকম আলখেল্লার মত পোশাক পরে, বাদামী রঙের, তেমনি পোশাক লোকগুলোর গায়ে।

'এখানে কিছু নেই,' আবার বলল সবচেয়ে বিশালদেহী লোকটা। 'যাও, ভাগো।'

দাঁত খিঁচাল টিটু। লোকটার কথার ধরন মোটেও পছন্দ হয়নি তার।

'আপনাদের কোন ক্ষতি করলাম?' সাহস করে বলল রবিন। 'ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে এসেছি আমরা।'

'ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে?' বলল লোকটা। 'তা হলে ঝুড়ি কোথায়? কীসে রাখবে? মিছে কথা বলে ফাঁকি দেবে আমাদেরকে, এতই সহজ?'

'যেতে বলা হচ্ছে, যাও!' ধমক দিয়ে বলল আরেকজন। 'নইলে পিঠের চামড়া তুলে নেব।'

'দেখুন না চেষ্টা করে!' রেগে গেল বাবলি। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল এক পা। 'দেখি, মারুন তো?'

তাকে সহযোগিতা করার জন্যই যেন গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে গেল টিটু।

'এই মেয়ে, বেশি গলাবাজি কোরো না বলে দিলাম! কষে মারব এক চড়!' চড় মারার জন্য হাত তুলল লোকটা।

লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল মুসা। বাবলির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, 'চলে এসো! সবখানেই তোমার বেশি বেশি! মারবে তো!'

'ছাড়ো, হাত ছাড়ো!' ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটানোর চেষ্টা করল বাবলি। 'দেখি না, কীভাবে মারে! এত সহজ…'

যেভাবে মারমুখো হয়ে আছে লোকটা, সত্যি সত্যিই মেরে বসবে, বুঝতে পেরে কিশোর বলল, 'থাক, বাবলি, চলে এসো। এখানে ভাল ব্যাঙের ছাতা নেই, সব বিষাক্ত। খাওয়া যাবে না। অহেতুক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

বলে আর দাঁড়াল না ওখানে সে। ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করল। পিছু নিল তার বন্ধুরা। টিটু চলল সবার পেছনে, যেন সবাইকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। ভাবখানা, কোন বিপদ এলে আগে আমার উপর আসুক।

লোকগুলোর কাছ থেকে সরে এসে কুকুরটার মাথা চাপড়ে আদর করে বলল মিশা, 'লক্ষ্মী টিটু।'

খুব বেশি দূরে সরল না ওরা। ছোট একটা পাইনের জঙ্গল দেখে তাতে ঢুকে পড়ল।

'ব্যাটারা আস্ত শয়তান!' রাগ করে বলল রবিন।

'ওরা কে?' অনিতার প্রশ্ন। 'কী করতে এসেছে?'

'আগে কখনও দেখিনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এমন ভাব করল যেন ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে গেছি আমরা।'

'কই গেলাম?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ওটা কারও ব্যক্তিগত জায়গা নয়। তা ছাড়া এমন তো কিছু করিনি আমরা, শুধু ঘাসের মধ্যে খোঁজাখুঁজি…'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'আমরা যা খুঁজতে গেছি, ওরাও হয়তো তা-ই খুঁজতে গেছে!'

'তারমানে ফ্লাইং সসার?' অবাক হলো ডলি।

'সসারের রেখে যাওয়া চিহ্ন।'

'তারমানে কি কাল সন্ধ্যায় আমাদের মত ওরাও সসার দেখেছে? অন্ধকারে আমাদের কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়েছিল?' মিশা বলল।

'ভয় পেয়েছে নিনা। কাঁপা গলায় বলল, 'আমি আর এক সেকেন্ডও থাকব না এখানে।'

'আমিও না,' তার সঙ্গে সুর মেলাল বাবলি, রাগ পড়ে গেছে। এখন ভয় পেতে শুরু করেছে আবার। 'আমার এসব পছন্দ হচ্ছে না। কোনখান থেকে বিপদ এসে ঘাড়ে পড়বে কে জানে! গত চব্বিশ ঘণ্টায় কতগুলো বিপদ গেল আমার মাথার উপর দিয়ে। আরেকটু হলেই পেঁচায় ঠুকরে মেরে ফেলেছিল। তারপর প্রায় ধরেই নিয়ে যাচ্ছিল ফ্লাইং সসারে করে। এখন পাঁচ-পাঁচটা ভয়ানক ডাকাত ছুরি নিয়ে তাড়া করল।'

'ছুরি?' মুসা অবাক। 'কই, আমি তো কোন ছুরি দেখলাম না?'

'দেখোনি তো কী হয়েছে? আছে। ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ছুরি আছে। চেহারা দেখনি?'

হাঁ করে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

'হ্যাঁ,' বাবলির কথা সমর্থন করল নিনা, 'নিশ্চই আছে। ওরকম চেহারার লোকের কাছে ছুরি না থেকেই পারে না।'

'না, পারে না, বলেছে,' তর্ক শুরু করল মুসা। 'যত্তো সব গাঁজাখুরি চিন্তা-ভাবনা। এই বুদ্ধি নিয়ে করবে গোয়েন্দাগিরি...'

'হয়েছে হয়েছে, থামো,' ভাইবোনে আবার লেগে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর। বাবলি আর নিনার দিকে চেয়ে বলল, 'অযথা ভয় পাচ্ছ তোমরা। এখানে আমরা নিরাপদ। ওরা কিছু করতে আসবে না।...'

টিটুর চিৎকারে থেমে গেল সে। কখন যে ওখান থেকে সরে গেছে কুকুরটা, খেয়ালই করেনি।

'টিটুর কী হয়েছে!' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল মিশা।

'ও কোথায়?' চারপাশে তাকিয়ে খুঁজছে ডলি।

'এখানেই তো ছিল!' ববও বুঝতে পারছে না।

'ডেকেছে তো মনে হয় ওদিকের ঝোপ থেকে,' আঙুল তুলল রবিন। 'আবার লোকগুলোকে কামড়াতে গিয়ে বিপদে পড়ল না তো?'

'টিটু! অ্যাই টিটু!' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। 'কোথায় তুই? টিটু?'

কিন্তু আশপাশের কাঁটা ঝোপগুলোয় যেন ঢাকা পড়ে গেল তার ডাক। টিটুর কানে পৌঁছল না বোধহয়। সাড়া দিল না সে।

ভয় পেয়ে গেল ওরা। পিটিয়ে টিটুকে বেহুঁশ করে ফেলল না তো লোকগুলো? নাকি মেরেই...

অপয়া কথাটা ভাবতে চাইল না কেউ।

'দিনটাই আজ খারাপ!' কেঁদে ফেলবে যেন মিশা। 'আজ সসার খুঁজতে বেরোনোই উচিত হয়নি!'

ঠিক ওই সময় আবার শোনা গেল টিটুর ডাক। উত্তেজিত, তবে আনন্দে। কী দেখে এতো খুশি হলো সে?

'ওই যে! ওই তো আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আরে, ওটা কী আনছে?' অনিতা বলল। মুখে করে কী যেন নিয়ে আসছে টিটু।

'আশ্চর্য!' কিশোর বলল। 'চকলেট! ব্যাটারা আমাদের জন্য চকলেট পাঠাল?'

কিশোরের পায়ের কাছে এনে চকলেটটা নামিয়ে রাখল টিটু।

'মেরি চকলেট,' রবিন বলল। 'দেখো, মোড়কের গায়ে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে।' প্যাকেটটা তুলে নিয়েছে সে।

'এই চকলেটের নামও শুনিনি জীবনে,' ডলি বলল।

'আমিও না,' বলল বব।

'টিটু, কে দিয়েছে তোকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নাম তো আর বলতে পারে না টিটু, শুধু বলল, 'হুফ! হুফ!'

'ওই সাংঘাতিক লোকগুলো নিশ্চয় দেয়নি?' মিশা বলল।

'হুফ! হুফ!' আবার একই কথা বলল টিটু। ছুটতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে আরও দু'বার হুফ হুফ করল, তারপর ঘুরে আবার দৌড়।

'ওর পিছে যেতে বলছে,' মুসা বলল। 'এসো, যাই।'
সবাই ছুটল।
'কোথায় চকলেট পেয়েছে, আমাদের দেখাতে নিয়ে যেতে চায়,' দৌড়াতে দৌড়াতে কিশোর বলল।
ওরা তার কথা বুঝতে পারায় খুব খুশি হয়েছে টিটু। লেজ নেড়ে আগে আগে চলল। বন থেকে বেরিয়ে এসে ওটার কিনার ধরে এগোল কিছুদূর, তারপর মোড় নিল পাহাড়ের ঢালের দিকে। এসে দাঁড়াল একটা ঘন ঝোপের ধারে। দুই বার হুফ হুফ করল।
'এখানেই চকলেট পেয়েছে বলছে,' মিশা বলল। 'ওই ঝোপের পাশে।'
'পাশে না, ভেতরে পেয়েছে,' হাত তুলে দেখাল রবিন। 'ওই যে, এখনও ফাঁক হয়ে আছে। ওখান দিয়েই ঢুকেছিল।'
কাঁটাঝোপের যেখান দিয়ে টিটু ঢুকেছিল সেখানে একটা ফোকরমত হয়ে রয়েছে। কিশোর বলল, 'আমি ঢুকছি!'
'আমিও,' মুসাও ঢোকার জন্য তৈরি হলো।
সরু ফাঁকটা দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'জনে। ঢুকেই চিৎকার করে উঠল মুসা, 'বাপরে, গেছি! কী কাঁটারে বাবা!'
'উফ!' কিশোর বলল। 'আমার আঙুলে ফুটেছে!'
'কিছু দেখা যায়?' ফাঁকের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল বব।
'যায়,' জবাব দিল মুসা। 'শুধু কাঁটা!'
'ওরকম জায়গায় চকলেট ফেলতে গেল কে?' বাবলির প্রশ্ন। ওর ধারণা, হয় টিটু ভুল করেছে, নয়তো লধশেরা কুকুরটাকে বিশ্বাস করে ভুল করছে।
'আকাশ থেকে পড়েছে,' হেসে বলল নিনা।
কিন্তু লধশদের টিটকারি দিতে গিয়ে যে কতটা সত্যি কথা বলে ফেলল সে, নিজেই বুঝতে পারল না।
ঝোপের ভিতর থেকে কিশোরের চিৎকার শোনা গেল, 'ফ্লাইং সসার! ফ্লাইং সসার!'

পাঁচ

ঝোপের বাইরে থেকে প্রায় একসাথে কলরব করে উঠল সব ক'টা ছেলেমেয়ে।
'ফ্লাইং সসার!' জবাব দিল মুসা। 'চকলেটে বোঝাই!'
'কী করছ তোমরা ওখানে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'কী বলছ?'
'ওই যে, মুসা বলল,' হেসে উঠল কিশোর। 'চকলেটে বোঝাই ফ্লাইং সসার।'
'ওরা আমাদের নিয়ে মজা করছে!' রাগ করে বলল বব।
'বেশ, আমিও আসছি,' ভিতরে ঢোকার জন্য তৈরি হলো রবিন। 'কী আছে নিজেই দেখব। কাঁটার নিকুচি করি।' ঝোপের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে।

ববও ঢুকল তার পেছনে। অনেকটা বোকা হয়েই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল পাঁচটি মেয়ে। ওরা ঢোকার সাহস করতে পারছে না।

ঝোপের মাঝখানে এসে বিস্ময়ে থমকে গেল বব আর রবিনও। মজা করেনি ওদের সঙ্গে মুসা আর কিশোর। কাঁটাঝোপের মাঝে কাত হয়ে পড়ে আছে ফ্লাইং সসারটা। ভাঙা। ভিতরের চকলেট মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

'হায় হায়!' হতাশ হয়ে বলল বব, 'এতো ছোট! মোটে একটা ট্রাকটরের চাকার সমান!'

'আসল ফ্লাইং সসার নয় তাহলে!' রবিনের গলায়ও হতাশার সুর। উত্তেজনা আর বিপদ কমে যাওয়ায় খুশি হয়নি সে।

'মেরি গো রাউন্ড–দ্য চকোলেট অভ টুমরো!' ফ্লাইং সসারের গায়ে লেখাটা জোরে জোরে পড়ল কিশোর।

'বাজি ধরে বলতে পারি, এটা এক ধরনের বিজ্ঞাপন,' মুসা বলল। 'দেখো, ভেতরে কম করে হলেও এখনও পঞ্চাশ প্যাকেট চকলেট রয়েছে।'

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে প্যাকেটগুলো গুনে গুনে বের করতে লাগল সে। 'পঁয়তাল্লিশটা,' শেষটা বের করতে করতে বলল। 'প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। দাঁড়াও দাঁড়াও, একেবারে নীচে একটা কাগজ রয়েছে। হাতে লাগছে।'

বের করে আনল ওটা। একটা ছোট পোস্টার। সোনালি বর্ডার দেওয়া। লাল রঙের একটা সীল রয়েছে।

পোস্টারের লেখাগুলো এবারও জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'এই মেরি সসারটা যে খুঁজে পাবে, মেরি গেম–এর সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা জিতবে সে। স্বাক্ষর: জেমস ব্র্যানডন, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেরি গো রাউন্ড চকোলেট, ওয়াটমোর।'

কিশোরের হাত থেকে পোস্টারটা নিয়ে নিজে আরেকবার পড়ল রবিন। 'বিজ্ঞাপনই।' নাক-মুখ কুঁচকে চেহারাটাকে বিকৃত করে ফেলল সে। 'চকলেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ফাঁদ। আর বোকা গাধার মত আমরা তাতে পা দিয়ে বসে আছি!'

'আমরা একা নই,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'পত্রিকাওলারাও ঠকেছে। ঠকেছে টেলিভিশন।'

'হুঁ,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা, 'বিজ্ঞাপনের ভাল বুদ্ধি বের করেছে। শীঘ্রি এই চকলেটের কথা সবাই জেনে যাবে, দ্য চকোলেট অভ টুমরো, অর্থাৎ আগামী দিনের চকলেটের কথা। ফ্লাইং সসার দিয়ে লোকের চোখে পড়িয়ে ছেড়েছে।'

হঠাৎ অনিতার চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে, 'এই কী করছ তোমরা? বেরিয়ে এসো। দেখাও কী পেয়েছ। আমরাও দেখব।'

'আসছি,' জবাব দিল কিশোর।

ঝোপের সুড়ঙ্গ ধরে আবার বাইরে বেরিয়ে এল ছেলেরা। চকলেট বিতরণ শুরু করল। এক মুঠো করে পেয়েও সন্তুষ্ট হলো না বাবলি আর নিনা। চেঁচাচ্ছে, 'আরেকটা দাও! এই, আমাকে আরেকটা!'

আর কিছু করার নেই এখানে। বাড়ি ফিরে চলল দলটা। প্যাকেট চকলেটে বোঝাই। ভাগে যা পেল সবই খেতে লাগল বাবলি আর নিনা, মিশার নিষেধ শুনল না। ডলিও হুঁশিয়ার করেছে ওদের, বেশি খেলে পেট ব্যথা করবে। কিন্তু কানেই নিল না দলের অস্থায়ী দুই সদস্য। খেয়েই চলেছে ওরা।

অন্যদের অত লোভ নেই। ওরা কম কম করে খাচ্ছে। এমনকী মুসা আর টিটুকেও হিসাব করে চকলেট দিল কিশোর, যাতে বেশি খেয়ে পেটে গোলমাল বাধাতে না পারে। চলার পথে ছোট একটা খাদে পানি জমে থাকতে দেখে পানি খেতে গেল টিটু। গিয়ে দেখতে পেল কতগুলো ব্যাঙ। ওগুলোর সঙ্গে খেলা জুড়ে দিল। বেচারা জীবগুলো বুঝতে পারল না টিটুর খেলা, ভয়ে লাফালাফি শুরু করল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের আঁধার নামছে। শহরের সীমানা চোখে পড়ছে। এই সময় ওদের পিছন থেকে এল গাড়িটা। সরু রাস্তায় গাড়িটাকে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য দ্রুত পথের একেবারে কিনার ঘেঁষে এক সারিতে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। সাংঘাতিক জোরে ছুটছে ওটা। শাঁ করে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হেডলাইট জ্বালায়নি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে, অবাক হয়ে ভাবল ওরা, ঘটনাটা কী? অন্ধকার হয়ে গেছে, তা-ও আলো জ্বালল না কেন?

'দেখলে?' অনিতা বলল। 'ওই পাঁচজন! আমাদেরকে তাড়িয়েছিল যারা তখন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। অনিতা ঠিকই বলেছে। ওই পাঁচজনই। পাহাড়ের উপরে কী করছিল লোকগুলো? এখন কোথায় গেল? ওরা কারা? অবাক হয়ে ভাবছে সে। কোন প্রশ্নের জবাব পেল না। ফ্লাইং সসারের ব্যাপারটা না হয় ফাঁকি। কিন্তু ওই লোকগুলোর ব্যাপারটা? ওরা অদ্ভুত আচরণ করল কেন?

রাতের খাওয়ার পর চাচা-চাচীর সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখছে কিশোর। সঙ্গে মিশা। বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে আরেকবার বলছে ফ্লাইং সসারের কথা। আবার দেখা গেছে। মিশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর।

'অবাক কাণ্ড!' রাশেদ পাশা বললেন।

'পোস্ট অফিসে শুনে এলাম,' মেরিচাচী বললেন, 'একজন বলছে, সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে ওই সসার। কাল রাতে। টরলিং ক্যাসলের ওপরের আকাশে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে আর সাহস করল না কিশোর ও মিশা, হেসে ওঠার ভয়ে।

'কিছু কিছু লোক আছে, কেমন যেন!' রাশেদ পাশা বললেন। 'একজন হয়তো কিছু একটা কল্পনা করে কয়েকজনের সামনে বলল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল। ওই লোকগুলোর অনেকেই তখন বলে বেড়াতে আরম্ভ করবে, জিনিসটা বা ঘটনাটা সে নিজের চোখে দেখেছে। গুজব এভাবেই ছড়ায়।'

বলে চলেছে সংবাদ পাঠক: গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক জায়গায় ফ্লাইং সসার দেখা গেছে।

এবার ভুরু কুঁচকাতে হলো কিশোরকে। ওরা দেখেছে টরলিং ক্যাসলের কাছে। কিন্তু শত শত কিলোমিটার দূরের লোকেরা সেটা কীভাবে দেখল?

একই সসারের কথা বলেছে ওরা? চকলেট কোম্পানির ওটাই? সন্দেহ হলো কিশোরের। ওরা ঝোপের মধ্যে যেটা খুঁজে পেয়েছে, সেটা নিছক বিজ্ঞাপনের জন্য বানানো হয়েছে। আসল সসার নয়। কয়েক মিনিটে শত শত কিলোমিটার কিছুতেই পাড়ি দিতে পারবে না।

তারমানে কী অনেকগুলো সসার? সবই ছেড়েছে মেরি গো রাউন্ড কোম্পানি?

যদিও ওরা তখন আলোচনা করে ঠিক করেছে, বয়স্কদের এ-সম্পর্কে কিছু জানাবে না, কিন্তু এখন কিশোরের মনে হলো জানানো উচিত। বলা যায় না, শুধু বিজ্ঞাপন না-ও হতে পারে এসব। বিজ্ঞাপনের আড়ালে অন্য কোন মতলবও থাকতে পারে কারও। পকেট থেকে চকলেটের একটা প্যাকেট বের করে চাচাকে দেখাল সে। সব কথা জানাল।

কিশোরের মুখে শুনে, পোস্টার পড়ে, হো হো করে হাসতে শুরু করলেন রাশেদ পাশা। 'তোরাই তা হলে খুঁজে পেলি!...হাহ্ হাহ্ হাহ্ হা! অনেক বড় মানুষের চেয়ে তোদের বুদ্ধি বেশি। বোকার মত ইউ এফ ও-র গল্পে বিশ্বাস করিসনি। হোহ্ হোহ্ হো!'

কাগজটা নিয়ে মেরিচাচীও পড়লেন। বললেন, 'আশ্চর্য! এরকম একটা কাণ্ড...!' হাসতে আরম্ভ করলেন তিনিও।

মিশাও হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। গম্ভীর হয়ে কিছু ভাবছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নীচের ঠোঁটে। ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে দেখতে পারছে না সে নিশ্চয়ই?

কিশোর ভাবছে: ফ্লাইং সসারের খেলা দেখিয়ে বিজ্ঞাপন আরম্ভ করেছে বটে মেরি কোম্পানি, কিন্তু এই খেলার আড়ালে 'ভিনগ্রহ' থেকে সবুজ মানুষ নামিয়ে না আনলেই হয় এখন!

ছয়

রাশেদ পাশা কথা দিলেন, পরদিন কিশোর আর তার বন্ধুদের নিয়ে যাবেন ওয়াটমোরে, চকলেট কোম্পানিতে, খেলায় জেতার পুরস্কার আনতে।

পরদিন ওয়াটমোরে যাওয়ার জন্য গাড়ি বের করলেন তিনি। ভ্যানের কাছে দৌড়ে এল কিশোর, মিশা আর টিটু।

'বাহ্, ভালই তো সেজেছিস দুজনে,' রাশেদ পাশা বললেন।

'চাচী সাজিয়ে দিল,' ভ্যানের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল কিশোর। 'আমার এতসব পরতে ভাল্লাগে না। চাচীর যুক্তি, পুরস্কার আনতে যাচ্ছি যখন সেজেগুজে যাওয়াই ভাল। আমি এতে ভালর কিছু দেখি না।'

'আমিও না,' কিশোরের পক্ষ নিল মিশা। 'টিটুই আরামে আছে। এতসব পরতে হয় না। চুলে ফিতে বাঁধার ঝামেলা পর্যন্ত নেই। কুকুর হয়ে বেঁচে গেছিস

'হুঁ, টিটু।'

মুখ টিপে হাসলেন রাশেদ পাশা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি বের করে আনলেন বাইরের পথে। জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথমে কাকে তুলে নেব? মুসাকে?'

'চলো।'

হর্ন বাজাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মুসা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বাবলি আসবে না।'

'না,' মুসা জানাল। 'প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না।'

'নিনার কী অবস্থা? জিজ্ঞেস করল মিশা।

'একই অবস্থা,' খুশিতে দাঁত বের করে হাসল মুসা।

'খুব ভাল হয়েছে,' গজগজ করতে লাগল মিশা। 'কাল কত করে মানা করলাম, এত চকলেট খেয়ো না। শুনল না। এখন বুঝুক মজা।'

বব, রবিন, ডলি আর অনিতাকেও তুলে নেওয়া হলো। বাবলি আর নিনা আসতে না পারায় ওরাও খুশি।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এল ভ্যান। ওয়াটমোরের সড়ক ধরে ছুটল। বেশ বড় শহর, ঘণ্টাখানেক লাগবে যেতে। যাওয়ার সময় পাশে সেই পাহাড়টা পড়ে, যেটার উপর রয়েছে টরলিং ক্যাসল। ছেলেমেয়েরা সবাই মুখ তুলে তাকাল। দেখার চেষ্টা করল সেই জায়গাটা, যেখানে নেমেছিল ফ্লাইং সসার, যেখানে এসে ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পাঁচজন বিশালদেহী লোক। কিন্তু তাদেরকে দেখা গেল না আজ।

অবাক হয়ে কিশোর ভাবল, ফ্লাইং সসার রহস্যের এখানেই কী শেষ?

দিনটা চমৎকার। সবাই বেশ হাসিখুশি। পুরস্কার আনতে যাচ্ছে, খুশি হওয়ারই কথা।

এগারোটা নাগাদ সাইনবোর্ড দেখা গেলঃ ওয়াটমোরে স্বাগতম। তারমানে এসে গেছে। শহরে ঢুকে একটা পথের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, 'আচ্ছা, মেরি গো রাউন্ড চকলেট কোম্পানিটা কোথায় বলতে পারেন?'

'মেরি গো রাউন্ড?' ভুরু কুঁচকাল মহিলা। 'সরি। নামই শুনিনি। আপনি ঠিকমত জেনে এসেছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। যাকগে…দেখি, আর কাউকে জিজ্ঞেস করে। খুঁজে বের করতে পারব। থ্যাংক ইউ।'

একজন ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে এসে আবার গাড়ি থামালেন তিনি। কোম্পানিটা কোথায় জিজ্ঞেস করলেন।

মহিলার মতই পুলিশও অবাক। 'কী জানি!' গাল চুলকাল সে। 'নামটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না…নতুন কোম্পানি?'

'তা হতে পারে।'

'না, ওই নাম শুনিনি। গোল্ডেন ঈগল চকলেট ফ্যাকটরি আছে এই শহরে, বন্ধ করে দেবে শুনছি। আর আছে সুইট সাইডার। অন্য কোন নাম তো মনে

পড়ছে না।'

তাকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগোলেন রাশেদ পাশা।

'আজব ব্যাপার,' কিশোর বলল। 'একটা চকলেট কোম্পানির খবর রাখে না লোকে! শহরটা বোধহয় অনেক বড়।'

'নামটা বদলে রাখলে কেমন হয়?' মুসা বলল। 'ভূতুড়ে চকলেট কোম্পানি।'

'মন্দ না,' ডলি বলল। 'তবে ওই নাম বলেও তো আর আসল কোম্পানি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'গোল্ডেন ঈগলেই গিয়ে দেখি,' রাশেদ পাশা বললেন, 'এক কোম্পানি আরেক কোম্পানির খবর রাখতে পারে।'

গোল্ডেন ঈগল খুঁজে পেতে কোন অসুবিধেই হলো না। যাকেই জিজ্ঞেস করা হলো, বলে দিল কোনদিকে। ওয়াটমোরের সকলেই যেন জানে ওটার খবর।

ঠিকানা জেনে নিয়ে এগোলেন রাশেদ পাশা। পথের মোড় ঘুরতেই চেঁচিয়ে উঠল ডলি, 'ওই যে! আবি, নতুন সাইনবোর্ড লিখছে দেখি!'

'এম...এ...আর...!' বিড়বিড় করল মুসা।

'মেরি!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'এবার বোঝা গেল। আগের মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে নতুন মালিক, নতুন নাম রেখেছে।'

'চলো, চলো, জলদি চলো,' ভিতরে ঢোকার তর সইছে না আর অনিতার। 'দেখি কী আছে?'

গাড়ি থেকে নেমে আগে আগে চললেন রাশেদ পাশা, পিছনে দল বেঁধে চলল ছেলেমেয়েরা। টিটুও বেশ মজা পাচ্ছে। লাফাতে লাফাতে চলেছে সে।

'দেখো না কেমন জিভ বেরিয়ে পড়েছে,' হেসে বলল মিশা। 'চকলেটের গন্ধ পেয়েছে তো!'

'ওকে দোষ দেয়া যায় না,' বব বলল। 'আমারই জিভে পানি এসে যাচ্ছে।'

যতই এগোচ্ছে ওরা, বাতাসে ততই তীব্র হচ্ছে চকলেটের সুবাস। রিসিপশন ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই।

ডেস্কের ওপাশে বসা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, 'মিস্টার ব্র্যানডন আছেন?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছেন?' মেয়েটা জানতে চাইল।

'না, তবে এটা নিয়ে এসেছি। আশা করি এতেই চলবে,' পোস্টারটা বের করে টেবিলে রাখলেন রাশেদ পাশা।

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। 'আপনারাই ফার্স্ট! আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। মিস্টার ব্র্যানডন খুব খুশি হবেন।'

অনেকগুলো বারান্দা, সিঁড়ি পেরিয়ে একটা কাঁচঘেরা জায়গায় চলে এল ওরা। এখান থেকে নীচে কারখানার কাজকর্ম অনেকখানিই দেখা যায়। অবাক হয়ে দেখতে লাগল ছেলেমেয়েরা। বিরাট বিরাট মেশিনে চকলেট তৈরি হচ্ছে। তৈরি করা গরম চকলেট সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে পাশের এক জায়গায়। সেখানে রেখে ঠাণ্ডা করে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আরেকখানে, প্যাকেট করার জন্য।

ওখান থেকে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিসে।

দরজায় টোকা দিয়ে পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার লাগিয়ে দিল রিসিপশনিস্ট। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে ওদেরকে ভিতরে যেতে বলল।

'কংগ্রাচুলেশন!' ছেলেমেয়েদেরকে বললেন মিস্টার ব্র্যানডন। 'বসো তোমরা। আপনিও বসুন, প্লিজ,' রাশেদ পাশাকে বললেন তিনি।

চেয়ারের টান পড়ে গেল। আরেক ঘর থেকে কয়েকটা চেয়ার এনে সাজিয়ে দিল রিসিপশনিস্ট। বসল সবাই।

'অনেক প্রশ্ন আছে নিশ্চয় তোমাদের?' হেসে ছেলেমেয়েদের বললেন ব্র্যানডন। 'শুরু করো। আমি তৈরি।'

প্রথম প্রশ্নটা করল ডলি। 'মিস্টার ব্র্যানডন, একটা ব্যাপার বড় অবাক লেগেছে। যাকেই জিজ্ঞেস করলাম, মেরি কোম্পানির নাম বলতে পারল না। চেনে না। কেন? আর নামই বা বদলানো হয়েছে কেন?'

'বলছি।' চশমার কাঁচ মুছে ঠিকমত আবার নাকের উপর বসালেন মিস্টার ব্র্যানডন। 'শোনেনি, তার কারণ, সবে কাজ শুরু করেছি আমরা। আপাতত গোপন রাখতে চাইছি, বিজ্ঞাপনের খাতিরে। তারপর হঠাৎ জানান দিয়ে চমকে দেব সবাইকে। তাতে মস্ত বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে।'

'কারখানার শ্রমিকদের মুখ বন্ধ রাখবেন কীভাবে?' রবিন জানতে চাইল।

'মুখ খুলবে না কথা দিয়েছে ওরা। তা ছাড়া গত কিছুদিন ধরে এই বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক আনন্দ করছে ওরা, আরও করবে। গোপন কথা আগেই বলে দিয়ে মজা নষ্ট করতে চাইবে না।'

'গোল্ডেন ঈগলের ব্যাপারটা কী বলুন তো?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'ওরা ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। সুবিধে করতে পারছিল না। পরে আমি কিনে নিয়েছি। নতুন নামে ব্যবসাটা চালু করতে চাই আবার। নতুন মেশিনপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বসিয়ে ফেলেছি। আরও অনেক আসছে।'

'ফ্লাইং সসারের কথা বলুন,' অনুরোধ করল অনিতা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অনেক বেশি মজার বিষয়। তা কী বলব?'

'কী করে ওটা ওড়ে? কন্ট্রোল করা হয় কীসের সাহায্যে, রেইডার? ধোঁয়া বেরোয় কীভাবে? দূর থেকেও কী ওটা দেখতে পান আপনি, কোনও যন্ত্রের সাহায্যে?' কয়েক কণ্ঠে হলো প্রশ্নগুলো।

'ওরিব্বাপরে, এত প্রশ্ন!' হাসলেন ব্র্যানডন। 'ঠিক আছে, এক এক করে বলছি। হালকা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সসারের শরীরটা। ওড়ার যন্ত্র আছে ভেতরে। অটোমেটিক পাইলটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একবার ওটাকে উড়িয়ে দেয়ার পর আর কোন যোগাযোগ থাকে না আমাদের সঙ্গে।'

সসারের আলোচনায় রাশেদ পাশাও মজা পাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাকসিডেন্ট করে না তো? কোন বিপদ-টিপদ?'

'না,' মাথা নাড়লেন ব্র্যানডন। 'খুবই হালকা। চলে ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার বেগে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। ভেতরে বসানো হয়েছে একটা বিশেষ ফটো-ইলেকট্রিক সেল সিসটেম, যেটা বিশ মিটার দূর থেকেই চলমান জিনিস বা প্রাণীর খবর পেয়ে যায়। সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগানো থেকে বাঁচায়

সসারটাকে।'

'কিন্তু সব সময় তো ওপরে থাকে না, নীচেও নামে,' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'যদি কোন বাড়ির ছাদে লেগে ভাঙে? কিংবা জানালায় বাড়ি খায়?'

'ওরকম কিছু ঘটবে না,' ব্র্যানডন বললেন। 'কারণ, ব্যস্ত শহর, রাস্তা, কিংবা লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে ছাড়া হয় সসার। ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি করে দেয় অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার। দাঁড়াও, প্রোগ্রামটা পড়ে শোনাই, তা হলেই বুঝতে পারবে।' ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করে জোরে জোরে পড়লেন তিনি, 'মেরি ফ্লাইং সসারের জন্য সাইক্লিক সিসটেম প্রোগ্রাম। এক, গতিবেগ ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার। দুই, ধীরে ধীরে মাটিতে নামবে। ধোঁয়া-বোমা ফাটবে। সাইরেন বেজে উঠবে। তিন, মাটির দশ মিটার উঁচুতে ভেসে থাকবে। দ্বিতীয় দফা ধোঁয়া-বোমা ফাটবে, রঙ পরিবর্তন হতে থাকবে। চার, মাটিতে নামবে। জ্বলে উঠবে জাইরোস্কোপিক আলো। মাটিতে থাকবে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। পাঁচ, আবার উঠবে। সবগুলো লাইট একসাথে জ্বলবে। ধোঁয়া-বোমা ফাটবে। নিভে যাবে জাইরোস্কোপিক আলো। ছয়, দ্রুত উঠে যাবে একশো মিটার উঁচুতে। বোমা ফাটা বন্ধ। সাইরেন বন্ধ। সাত, ডানে মোড় নিয়ে চলতে শুরু করবে। গতিবেগ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে তিরিশ কিলোমিটার।'

স্তব্ধ হয়ে শুনছে শ্রোতারা।

'প্রোগ্রামিং করা হয়েছে আধ ঘণ্টা পর পর,' কাগজটা রেখে দিলেন ব্র্যানডন। 'দশ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এক ঘণ্টায় দু'বার উড়বে। তিন ঘণ্টা ওড়ার পর যেখান থেকে ছাড়া হয়েছিল সেখানে ফিরে আসবে সসার, সেই ব্যবস্থা করা আছে। তারপর দুই ঘণ্টা ওড়া বন্ধ। ওই সময়ে ওটার ব্যাটারি রিচার্জ করা হবে, টুকিটাকি অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকলে, সেসব করা হবে। অটোমেটিক পাইলট একবার সেট করে দেয়ার পর মোট একশো ঘণ্টা উড়বে একটা সসার, তারপর ওটার আয়ু শেষ। আর উড়তে পারবে না।'

'তাজ্জব কাণ্ড!' বিড়বিড় করল রবিন।

'আরেকটা ব্যাপার,' ব্র্যানডন বললেন, 'বেআইনী কিছু করছি না আমরা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তবেই করছি।'

'এতক্ষণে বুঝলাম,' বব বলল, 'পুলিশ বা মিলিটারি কেন কিছু করছে না সসারের ব্যাপারে, কেন দেখেও না দেখার ভান করে চুপ করে আছে।'

'খবরের কাগজের লোকেরা কী সব জানে?' অনিতা জিজ্ঞেস করল।

'না। ওদেরকে বলে দিলে আর কোন কথা গোপন থাকবে না, আমাদের বিজ্ঞাপন শেষ। আসলে না জেনে ওরাই এখন বিজ্ঞাপন করছে আমাদের।'

'তা ঠিকই বলেছেন,' মাথা দোলাল মুসা।

এতক্ষণ সবাই প্রশ্ন করেছে, অনেক কথা বলেছে, কিন্তু কিশোর একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ শুনেছে, আর ভেবেছে। এখন ভাবছে, এত সহজেই কী শেষ হয়ে গেল চমৎকার একটা রহস্যের? নাকি আরও কিছু আছে?

অবশেষে প্রশ্ন করল কিশোর, 'টেলিভিশনের খবরে বলল, অনেক জায়গায় দেখা গেছে সসার। কোন কোনটা একশো মাইল তফাতে। এটার কী ব্যাখ্যা? তিরিশ কিলোমিটার বেগে তো এত দূরে যাওয়ার কথা নয়?'

'ভাল প্রশ্ন। সসার একটা নয়, অনেকগুলো।' হাসলেন ব্র্যানডন। 'ভয় নেই, ভিনগ্রহবাসীরা এসে পৃথিবী আক্রমণ করেনি।'

চুপ হয়ে গেল আবার কিশোর।

'মোট দশটা সসার উড়িয়েছি আমরা,' ব্র্যানডন বললেন। 'একটা খুঁজে পেয়েছ তোমরা। খুঁজে পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।'

'পেতাম না,' রবিন বলল। 'আমাদের ভাগ্য ভাল, নামার সময় ঝোপে লেগে ভেঙে গেছে ওটা। আর উড়তে পারেনি।'

'রাত্রে যে ঝড় হয়েছিল,' বব বলল, 'আমার মনে হয় সেই ঝড়ে ভেঙেছে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' মাথা ঝাঁকালেন ব্র্যানডন। 'বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ঝোপের ওপর। তারপর আর উড়তে পারেনি।'

'অন্য সসারগুলোকে কী করবেন?' কিশোর জানতে চাইল।

'ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত উড়বে ওগুলো। আর যখন ব্যাটারি রিচার্জ করা যাবে না, ওড়ানো শেষ হবে। সেটা হবে কাল নাগাদ। তবে আজ সন্ধ্যায়ই রেডিও আর টেলিভিশনে জানিয়ে দেব সব কথা। কাল নাগাদ এই অঞ্চলের সমস্ত ছেলেমেয়ে জেনে যাবে আমাদের চকলেটের কথা। দল বেঁধে কাল বেরিয়ে পড়বে ওরা সসার শিকারে। আজ রাতের মধ্যেই সমস্ত দোকানে দোকানে পৌঁছে যাবে মেরি চকলেট। আমি জানি, কাল বিকেল হতে হতে ওগুলোর আর একটাও থাকবে না কোন দোকানে।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ব্র্যানডন।

এসব কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না টিটুর। চকলেটের গন্ধ পেয়েছে, কিন্তু এতক্ষণে একটাও খেতে পায়নি। বিরক্ত হয়ে একপাশে শুয়ে ঘুমিয়েই পড়ল সে।

'কী রকম চলবে বলে মনে হয় আপনাদের চকলেট?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ভাল,' ব্র্যানডন জবাব দিলেন। 'সুইট সাইডারের চেয়ে তো ভাল অবশ্যই। এ-শহরে গোল্ডেন ঈগলের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুইট সাইডার চকলেট।'

'নাম শুনেছি,' মিশা বলল।

খুশি হলেন না ব্র্যানডন। 'শুনেছ বটে, তবে খুব বেশিদিন মনে থাকবে না আর। এরপর থেকে শুধু মেরিই খেতে চাইবে।'

'হয়তো,' সন্দেহ আছে রবিনের। 'সে যাই হোক, আমাদের পুরস্কার পাব তো? কী দেবেন?'

'পাবে।' মিটিমিটি হাসছেন ব্র্যানডন। 'চকলেট। যার যার ওজনের সমান।'

'বলেন কী! এত!' বিশ্বাস করতে পারছে না ডলি।

এই সময় বাজল টেলিফোন। রিসিভার তুলে নিলেন ব্র্যানডন। 'হ্যালো? হ্যাঁ,

জেমস বলছি।...হ্যাঁ হ্যাঁ... গুড মর্নিং, চীফ কমিশনার...'

কান খাড়া হয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। ওদের ধারণা, জরুরী কোন কথা হচ্ছে।

'কী? অসম্ভব!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন ব্র্যানডন। রিসিভার ঠেসে ধরলেন কানে। অস্বস্তিতে লাল হয়ে গেছে মুখ।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা। কী ঘটল?

'কিন্তু কীভাবে ঘটল?' কাঁপা গলায় বললেন ব্র্যানডন। 'না, চীফ কমিশনার, এটার জন্য বোধহয় আমরা দায়ী নই...'

শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা। কী ঘটল?

অবশেষে শেষ হলো টেলিফোনে কথা বলা। রিসিভার নামিয়ে রেখে আটজোড়া আগ্রহী চোখের দিকে তাকালেন ব্র্যানডন। 'অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে! বিশ্বাসই হচ্ছে না!' কেমন শূন্য শোনাল তাঁর গলা। 'এদিকের শহর আর গ্রামে নাকি আক্রমণ চালিয়েছে একটা পাগলা ফ্লাইং সসার। অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। বাগান নষ্ট করেছে, গাছপালা ধ্বংস করেছে।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। ভেঙে পড়েছেন।

'কিন্তু আপনি বললেন ওই সসার একেবারেই নিরাপদ,' কিশোর বলল। 'ছাড়াও হয়েছে খোলা অঞ্চলে, যেখানে বাড়িঘর বা লোকালয় নেই। কীভাবে এটা ঘটল?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না! এখন পুলিশ আমাকে দোষ দিচ্ছে। ওরা বলছে সব কিছুর জন্য নাকি আমিই দায়ী।'

আর কথা বলার মেজাজ নেই তাঁর। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুঃখিত, এভাবে হঠাৎ আলোচনা শেষ করে দিতে হচ্ছে। ভাল বিপদে পড়েছি। কী করা যায় ভাবতে হবে এখন আমাকে।'

উঠে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা। 'হ্যাঁ, বিপদই।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আচ্ছা, আসি। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।'

আর কী বলবেন? ছেলেমেয়েরাও সান্ত্বনা দেওয়ার মত কিছু বলতে পারল না। শুধু ব্র্যানডনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

গেটের বাইরে বেরিয়ে দেখল নতুন কোম্পানির নাম লেখা শেষ করেছে পেইন্টার।

বাড়ি ফিরে চলল আবার ভ্যান।

'এবার বোধহয় সত্যি সত্যি ভিনগ্রহবাসীরা আক্রমণ করল!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। 'আসল সসার আসার আর সময় পেল না? নকলগুলো ছাড়ার পর পরই এসে হাজির!'

'হুঁ,' ডলি বলল, 'অবাকই লাগছে।'

মিশা বলল, 'প্রতিশোধ নিতে এল নাকি? নকল সসার ছেড়ে চকলেট কোম্পানি বিজ্ঞাপন করছে, এটা সহ্য হচ্ছে না নাকি ভিনগ্রহবাসীদের?'

'না-ও হতে পারে,' মাথা দোলাল মুসা। 'একটা সাইন্স ফিকশনে পড়েছিলাম,

কয়েক আলোকবর্ষ দূর থেকে পৃথিবীর মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে হাজির হয়েছে ভিনগ্রহবাসী অতিবুদ্ধিমান জীব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। ভাবছে। ভিনগ্রহবাসীদের চেহারা একেকজনের কল্পনায় একেক রকম।

'খালু,' মিশা জিজ্ঞেস করল. 'আপনার কী মনে হয়?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না কিছু,' গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি। 'দেখা যাক কী ঘটে।' আর যা-ই হোক, ভিনগ্রহ থেকে এসে মানুষের উপর চড়াও হয়েছে কোন অতিবুদ্ধিমান জীব, এটা তিনি মানতে পারছেন না। নিশ্চয় অন্য কোন ব্যাপার, তাঁর অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।

তবে আগের দিন সন্ধ্যার মত ফ্লাইং সসারের ব্যাপারটা হেসে উড়িয়েও দিতে পারলেন না তিনি আজ। নীরবে গাড়ি চালালেন। দেখা যাক কী হয়, ভাবছেন তিনি।

কিন্তু দেখার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাঁকে। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছেন। শহরের সীমানা, বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছে সবাই। সামনের একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এই সময় ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলেন রাশেদ পাশা। একে অন্যের উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

আবার যখন সোজা হলো, জানালা দিয়ে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য!

ফ্লাইং সসার! বিশাল, চকচকে। নেমে আসছে শহরের উপর। কমলা রঙের বাষ্প ছড়াচ্ছে।

দেখে, গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।

বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে বাড়িগুলোর উপর দিয়ে চলে গেল ওটা। হারিয়ে গেল ছাতের আড়ালে। নিজের অজান্তেই কানে আঙুল দিয়ে ফেলল ডলি। তার ভয়, নিশ্চয় গিয়ে কোন বাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হবে সসারটা। কিন্তু হলো না। বিকট শব্দ শোনা গেল না। কয়েক সেকেন্ড পরে কিছু বাড়িঘরের উপরে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল শুধু। নির্বাক হয়ে দেখল ভ্যানের আরোহীরা, আবার উঠছে ফ্লাইং সসার। উঠতে উঠতে একটা বিন্দুতে পরিণত হলো, তারপর হারিয়ে গেল।

বিড়বিড় করে কী বললেন রাশেদ পাশা, বোঝা গেল না।

'চাচা,' কিশোর বলল, 'জলদি চলো, দেখি কী হয়েছে!'

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন রাশেদ পাশা, আবার চালু করলেন। দ্রুত ছুটলেন সেই বাড়িগুলোর দিকে, যেগুলোর উপরে ধোঁয়া দেখা গেছে।

হঠাৎ মাথার উপরে তীক্ষ্ণ শিস শোনা গেল।

সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মিশা, 'আবার আসছে!'

জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে, আতঙ্কিত চোখে দেখল লধশরা, আবার বাড়িঘরের কাছে গিয়ে নামছে সসারটা।

'বাপরে!' কানে আঙুল দিল বব। 'কী শব্দ করছে!' বাড়িগুলোর ছাতের উপরে পৌঁছে গেছে সসার।

'পোস্ট অফিসের ওপাশের বাড়িগুলোতে নামছে!' রবিন বলে উঠল।

শাঁই শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ির দিক পরিবর্তন করলেন রাশেদ পাশা। তারপর সোজা ছুটলেন সসারটার দিকে।

'বাষ্প! বাষ্প উড়ছে!' মুসা বলল। ওদের সামনে পথের উপর হালকা কুয়াশার মত বাষ্প। কিন্তু ওই জিনিস দেখে থামতে রাজি নন রাশেদ পাশা। কমলা বাষ্পের ভিতর দিয়ে ছুটে গাড়ি বের করে আনলেন তিনি অন্যপাশে।

পোস্ট অফিসের অন্য পাশে এসে থমকে গেলেন তিনি। অকল্পনীয় এক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সামনে।

আট

নেমেছে ফ্লাইং সসার। ঘন বাষ্প বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে। আর অদ্ভুত কতগুলো জীব নড়ছে সেই বাষ্পের ভিতরে। গায়ের চামড়া সবুজ ওগুলোর, চুলের রঙ লাল।

তোতলাতে লাগল মুসা, 'আ-আমি কি জে-জেগে আছি…!'

জেগেই আছে সে। দেখছে ওই আজব দৃশ্য। সাড়া পড়ে গেছে সমস্ত পাড়ায়। চৌরাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সসারটা। আশেপাশে জায়গার অভাব নেই, তবু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটার গায়ে আরেকটা ধাক্কা লাগিয়ে বসেছে কিছু গাড়ি। বেরিয়ে চলে গেছে ওগুলোর আরোহীরা, কেউ কেউ এখনও পালাচ্ছে। পথের উপর পড়ে রয়েছে অনেকগুলো সাইকেল, দাঁড়িয়ে আছে মোটর সাইকেল, আরোহী নেই, ফেলে পালিয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য প্যাকেট, ব্যাগ, বাক্স। আতঙ্কিত হয়ে হাত থেকে ওসব ফেলে ভেগেছে লোকে।

জোরে বাতাস বইল, উড়িয়ে নিয়ে গেল বাষ্প। স্পষ্ট দেখা গেল সসারটা। তেল ঢালার বিশাল একটা ধাতব চোঙের মত আকৃতি, চূড়ার কাছে খোলা। ওটার নীচে, সসারের পেটের ঠিক মাঝখান থেকে নেমেছে একটা মই, ইচ্ছে মত ভাঁজ করে রাখা যায় ওটা।

লাল চুলওয়ালা চারজন সবুজ মানুষ, রোবটের মত দেখতে, ঝটকা দিয়ে দিয়ে হাঁটছে।

হঠাৎ নীরব কোন আদেশ শুনেই যেন একসাথে দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো, হাত মাথার উপরে তুলে দাঁড়াল।

'আ-আমি…বি-বিশ্বাস করতে পারছি না!' ফিসফিসিয়ে বলল বব।

লোকগুলোর আঙুলের মাথা থেকে আলোর ছটা বেরোচ্ছে। ভয়ানক দৃশ্য! সহ্য করতে পারল না আর ডলি ও অনিতা, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

অন্যেরা তাকিয়ে রয়েছে। চোখ জ্বলে উঠল ভিনগ্রহবাসীদের। আঙুলের মতই চোখ থেকেও বেরোচ্ছে তীব্র আলোর ঝিলিক।

এসব দেখে হঠাৎ খেপে গেল টিটু। বন্ধ ভ্যানের মধ্যেই লাফালাফি শুরু করল। কেউ থামাতে পারল না তাকে। ওকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে মেঝেয়

পড়ে হাঁটু হয়ে গেল মিশার। তাকে অবাক করে দিয়ে দাঁত বের করে গর্জাতে লাগল টিটু। শেষে একলাফে সামনের সীটে গিয়ে পড়ে পাশের দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনের দু'পা দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলল দরজা। লাফিয়ে পড়ল বাইরে।

'এই টিটু, শোন শোন!' চিৎকার করে তার পিছু নিল কিশোর।

পাত্তাই দিল না টিটু। যত জোরে সম্ভব ছুটল সসারের দিবে।

'টিটু, আয়! আয় বলছি!' কুকুরটার পিছনে ছুটতে ছুটতে ডাকল কিশোর।

'এই কিশোর, ফিরে আয়! যাসনে! বোকা কোথাকার!' ডাকলেন রাশেদ পাশা। কিন্তু কিশোরও শুনল না তাঁর ডাক। বরং গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

বাষ্পের ভিতরে ঢুকে পড়ল টিটু। তাকে আসতে দেখেই ঘুরে সসারের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল চার ভিনগ্রহবাসী।

ওদের প্রায় কাছে পৌছে গেছে কিশোর, এই সময় হঠাৎ বেড়ে গেল শিসের মত তীক্ষ্ণ শব্দ। বাষ্প বেরোনো বেড়ে গেল। মাটি থেকে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল সসার। বাড়িঘরের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে উপরে, আরও উপরে। ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল আকাশে।

তারপর স্তব্ধ নীরবতা। কী ঘটে গেছে বুঝতে সময় লাগল কিশোরের। ফ্লাইং সসার চলে গেছে, সেই সাথে চলে গেছে তার প্রিয় কুকুরটাও। টিটুকে নিয়ে গেছে সসার।

'টিটু!' আকাশের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে উঠল কিশোর।

নেমে এল তার ছয় সহকারী।

'ওকে তুলে নিয়ে গেছে!' কেঁদে ফেলবে যেন কিশোর। 'ওকে…ওকে আর কোনদিন দেখতে পাব না!'

মিশা কাঁদতে শুরু করল। তার কান্না দেখে ডলি আর অনিতার চোখও শুকনো রইল না।

'পাগল!' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'যে জীবই হোক, পুরো পাগল ওরা। দেখো কী করে গেছে!'

ফিরে আসছে লোকেরা। ড্রাইভারেরা এসে দেখছে কতটা ক্ষতি হয়েছে তাদের গাড়ির। সাইকেল চালকেরা এসে রাস্তা থেকে তুলে নিচ্ছে তাদের সাইকেল। ব্যাগ, বাক্স যারা ফেলে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে কুড়িয়ে নিচ্ছে যার যার মাল। হৈ-চৈ, হট্টগোল শুরু হয়ে গেল।

সাইরেন বাজাতে বাজাতে এল পুলিশের গাড়ি। চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেমে এলেন ইনসপেক্টর। লোকের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করলেন কতখানি ক্ষতি হয়েছে।

লধশদের এখানে কিছু করার নেই। টিটুকে হারিয়ে সবারই মন খারাপ। ভ্যানে ফিরে এল ওরা। কুকুরটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা চাচাকে জানাল কিশোর।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিলেন রাশেদ পাশা।

•

লধশদের জরুরী মিটিং বসল বাগানের ছাউনিতে। কেউ কিছু বলছে না। এই

প্রথম সঙ্কেত নিয়ে মাথা ঘামাল না ওরা। মেঝেতে ফেলে রাখা ছেঁড়া কম্বল, যেটার উপর শুয়ে থাকত টিটু, সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না মিশা। ডলি আর অনিতাও মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। চোখের পানি, নাকের পানি মুছছে।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল রবিন। বলল, 'এভাবে কান্নাকাটি করলে তো চলবে না আমাদের। কিছু একটা করতে হবে। একটা কথা, টিটুকে কি ফ্লাইং সসারে ঢুকতে দেখেছি আমরা? দেখিনি। এত বেশি বাষ্প ছিল, দেখার উপায় ছিল না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' বব বলল। 'হয়তো সসারে ওঠেইনি। কি রকম রেগে গিয়েছিল মনে আছে? রেগেমেগে শেষে কী করেছে কে জানে!'

'তা হলে কি এখন ও ঝোপেঝাড়ে ঘুরে মরছে,' অনিতার প্রশ্ন, 'হারিয়ে গিয়ে?'

'হতেও পারে!' কিশোর বলল।

'হয়তো এক হাজার আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহের জঙ্গলে এখন সে ঘুরে মরছে। হয়তো ডাইনোসরেরা তাড়া করছে তাকে…' মুসার কথা শেষ হলো না।

'হুফ! হুফ! হুফ!' শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

'টিটু!' লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল মিশা।

ওই তো, বাইরে বসে রয়েছে তাদের প্রিয় কুকুর!

'টিটু, লক্ষ্মী টিটু, তুই এসেছিস!' বলতে বলতে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল মিশা। খেয়ালই করল না একজন তরুণও রয়েছে বাগানে, ওকে দেখে এগিয়ে আসছে।

'গুড আফটারনুন,' কাছে এসে বলল যুবক। কুকুরটাকে পেয়ে মেয়েটাকে খুশি হতে দেখে সে-ও খুশি।

তার কথা শুনতেই পেল না মিশা।

জবাবটা দিল কিশোর, 'গুড আফটারনুন। থ্যাংক ইউ। ভেতরে আসুন। টিটুকে কোথায় পেয়েছেন শুনব। যদি আপত্তি না থাকে।'

'না না, আপত্তি কীসের?' ঘরে এসে একটা বাক্সের উপর বসে নিজের পরিচয় দিল সে, 'আমার নাম রিচার্ড মরিসন। ছাত্র। বিশ মিনিট আগে কোভেন্ট্রি রোড ধরে চলেছি, হঠাৎ দেখি তোমাদের কুকুরটা ছুটে আসছে রাস্তা দিয়ে। আমি গাড়ি থামাতেই লাফ দিয়ে বনেটে উঠে পড়ল সে। জোরে জোরে চিৎকার করে কী যেন বোঝাতে চাইল আমাকে। বুঝলাম, লিফট চাইছে। কলারে বাড়ির ঠিকানা লেখা প্লেট রয়েছে। কাজেই এখানে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধে হলো না।'

'আপনার অনেক দয়া,' মুসা বলল। 'নিশ্চয় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আপনার, উল্টো দিকে এসেছেন।'

'আরে না না, তাতে কী,' মরিসন হাত নাড়ল। 'অনেক সময় এখন আমার হাতে। ঈস্টারের ছুটি চলছে তো। তোমাদের ইস্কুলও নিশ্চয় বন্ধ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কোন জায়গায় পেয়েছেন টিটুকে?'

'ওল্ড উইশিং ওয়েলের কাছে।'

'তার মানে কোভেলটির ওদিকে!' অবাক হয়ে বলল অনিতা। 'বাব্বা! এত দূরে গেল কীভাবে টিটু?'

'ভাল কথা মনে করেছ,' কিশোর বলল। 'আপনি ওকে পেয়েছেন বিশ মিনিট আগে, তাই না মিস্টার মরিসন? বেশ। আর টিটু হারিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে।'

'হ্যাঁ,' ঘড়ি দেখে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'তারমানে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় পেয়েছে কোভেলটিতে যাওয়ার। এই অল্প সময়ে দৌড়ে এতদূর চলে গেল? অসম্ভব!'

'হয়তো কোন গাড়িতে লিফট নিয়েছে?' সম্ভাবনার কথা বলল ডলি।

'উহুঁ,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আমি এখনও মনে করি, ভিনগ্রহবাসীরাই তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওকে।'

'কারা?' হাসি চাপতে পারল না মরিসন।

'ভিনগ্রহবাসী,' মুসা জানাল, 'ফ্লাইং সসারে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

হো হো করে হেসে উঠল মরিসন। 'বড় বেশি সাইন্স ফিকশন পড়ো তোমরা! হাহ্ হাহ্…'

'আপনি হয়তো জানেন না,' টিটুকে এখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছে মিশা, 'পৃথিবীতে ভিনগ্রহবাসীরা এসেছে ইউ এফ ওতে করে। প্রতিশোধ নিতে। রেডিও টেলিভিশনে ক'দিন ধরেই খবর বলছে।'

'তাই নাকি?' বিশ্বাস করতে পারছে না মরিসন। 'এক হপ্তা ধরে রেডিও শুনিনি অবশ্য। কয়েকজন বন্ধুর সাথে ক্যাম্পিঙে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে তোমাদের কুকুরটার সাথে পরিচয়।'

'সমস্ত কাগজেও সসারের খবর ছাপা হয়েছে,' কিশোর বলল। 'বসুন নিয়ে আসছি আমি।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে গেল সে। ফিরে এল একটা খবরের কাগজ নিয়ে। হেডিং দেখে অবাক হলো মরিসন। দ্রুত পড়ল খবরটা। বিড়বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! কল্পনাই করিনি কখনও…'

'তা হলে এখন বিশ্বাস করছেন তো?' বাধা দিয়ে বলল রবিন।

'অ্যাঁ…না…মানে, হ্যাঁ…কী বলব বুঝতে পারছি না…'

'আপনার সময় থাকলে বসুন,' বব বলল। 'সব কথা খুলে বলছি।'

সময় আছে জানাল মরিসন।

তাকে সব কথা খুলে বলা হলো। একেবারে গোড়া থেকে। কীভাবে সেদিন সন্ধ্যায় সসার দেখেছে, তারপর চকলেট খুঁজে পেয়েছে, চকলেট কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে টিটু হারিয়েছে, সব।

শুনে থ হয়ে গেল মরিসন। বলল, 'তোমরা সাধারণ ছেলে নও, অনেক বুদ্ধি তোমাদের। আমার ইচ্ছে করছে, তোমাদের কোনভাবে সাহায্য করি। কিছু কি করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন।' সুযোগটা হাতছাড়া করল না কিশোর। 'টিটুকে যেখানে পেয়েছেন, সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারেন আমাদের। কোন সূত্র হয়তো

পেয়ে যাব। সেটা অনুসরণ করে হয়তো বের করে ফেলতে পারব সসারটাকে। এখন আমার মনে হচ্ছে, চকলেট কোম্পানির সসারগুলোর মতই এটাও ভুয়া। ফাঁকিবাজি। ভিনগ্রহ থেকে আসেনি।'

নয়

বিশ মিনিট পর, উইশিং ওয়েলের কাছে এসে গাড়ি থামাল মরিসন। সামনে রাস্তায় তীক্ষ্ণ একটা মোড়।

'ওটার ওপাশ থেকে ছুটে এসেছে টিটু,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল সে। 'আমাকে শুধু লিফট দিতে বলেছে। কোন্ জায়গা থেকে এসেছে বলেনি।'

'বলবে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। গাড়িতে বসে থাকা টিটুকে ডাকল, 'টিটু, আয়, নাম। কোথা থেকে এসেছিলি?'

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে বার দুই লেজ নাড়ল টিটু। তার মনিব কী করতে বলছে, বুঝে ফেলল বুদ্ধিমান কুকুরটা। রওনা হয়ে গেল।

পিছনে গাড়িতে করে তার পিছু নিল দলটা। জোরে জোরে ছুটছে টিটু। গাড়ির গতি যত বাড়ছে, সে-ও গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবে মিনিট দশেক চলার পর থামল টিটু। 'হুফ! হুফ!' করে চেঁচাতে শুরু করল। তারপর রাস্তা থেকে নেমে পড়ল পাশের মাঠে।

গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখল মরিসন। ওদের জন্য অপেক্ষা করছে টিটু। ওরা মাঠে নামতে সে-ও রওনা হলো।

মাঠ পেরিয়ে ছোট একটা নদীর কিনারে চলে এল দলটা। নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে পাথরে ঢাকা পথ। বড় একটা বনের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

'ব্যক্তিগত এলাকা!' নিরাশ হয়ে একটা গাছে লাগানো সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল অনিতা।

'হোক,' ডলি বলল। 'বেড়াটেড়া যখন নেই, ঢুকতে বাধা কোথায়?'

'কিন্তু নীচে লেখা রয়েছেঃ অনুমতি ছাড়া ঢুকলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে!' বব বলল। লালের উপর সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা রয়েছে কথাটা।

'নীচের লেখাটা পড়েছ?' রবিন বলল।

পড়ল সবাই। লেখা রয়েছেঃ প্রোপার্টি অভ সুইট সাইডার চকলেট কোম্পানি।

'সুইড সাইডার চকলেট কোম্পানির জায়গা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'এতক্ষণে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে!'

'জলদি কর, টিটু!' তাগাদা দিল কিশোর। 'দেখা, কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল তোকে।'

টিটুকে অনুসরণ করে আবার চলল ওরা। চলে এল বনের মাঝখানে। আরও মিনিট দশেক চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল টিটু। কান খাড়া করে ফেলেছে। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল।

'মনে হয় পৌঁছে গেছি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'ওই যে, সামনে খোলা জায়গা,' মুসা দেখাল।

হ্যাঁ, খোলা জায়গাই। খানিকটা জায়গার বন সাফ করে ফেলা হয়েছে। উজ্জ্বল রোদ সেখানে।

'খুব সাবধান,' মরিসন বলল, 'শব্দ করবে না।'

বনের তলায় ঘন হয়ে জন্মে রয়েছে ঘাস আর শ্যাওলা, পা ফেললে নরম কার্পেটের মত দেবে যায়। ফলে ওদের হাঁটার শব্দ হলো না। গাছের আড়ালে আড়ালে এগোল ওরা। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে চলে এল খোলা জায়গাটার ধারে।

'ওই ঝোপটা অদ্ভুত লাগছে না?' রবিন বলল।

হ্যাঁ, অদ্ভুতই। খোলা জায়গার মাঝখানে যেন হঠাৎ করে গজিয়ে উঠেছে। অনেক উঁচু।

'একটা ফীল্ড গ্লাস থাকলে ভাল হত,' অনিতা আফসোস করল।

'দাঁড়াও,' মরিসন বলল, 'দেখে নিই ভালমত। কেউ থাকতে পারে। পনেরো মিনিট দেখব। তারপরও যদি কিছু না ঘটে, যা করার করব।'

সবাই একমত হলো একথায়, টিটু বাদে। সে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, চোখ উজ্জ্বল। তাকে শান্ত রাখাই মুশকিল হয়ে উঠল। শেষে বাধ্য হয়ে তার গলায় শেকল পরিয়ে দিল কিশোর। 'শ্‌শ্‌!' টিটুকে সাবধান করল সে। 'চুপ করে থাক। নইলে ধরা পড়ে যাব।'

অবশেষে আদেশ মানল টিটু। শুয়ে পড়ল ঘাসের উপর। তার আশেপাশে সবাই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ঝোপটার দিকে চোখ।

মিনিটের পর মিনিট কাটল। কোন নড়াচড়া দেখা গেল না, শব্দ হলো না। টিটুও চুপ করে আছে। তার মাথার উপর দিয়ে যখন প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, তখনও কিছু বলছে না। কামড় দিতে চাইছে না, থাবা দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে না, শুধু চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

ঘড়ি দেখল মরিসন। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেলে ইশারা করল সে, ওঠার জন্য।

'এবার কী করব?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ঢিল ছুঁড়লে কেমন হয়?' পরামর্শ দিল রবিন। 'কেউ থেকে থাকলে নিশ্চয় সাড়া দেবে।'

'ভাল বুদ্ধি,' একমত হলো ডলি। 'কিন্তু ঢিল পাবে কোথায়? ঘাস ছাড়া তো আর কিছু নেই।'

'পাইনের মোচা দিয়েই কাজ চালানো যাবে,' বলতে বলতে নিচু হয়ে কয়েকটা মোচা তুলে নিল কিশোর। মরিসনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন। আপনি ভাল ছুঁড়তে পারবেন। বেশি দূরে যাবে। আমরা ছুঁড়লে অতটা যাবে না।'

'ছুঁড়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না,' হাত বাড়াল মরিসন। 'তবু, বলছ যখন, দাও।'

যতটা জোরে সম্ভব, একটা মোচা ছুঁড়ে মারল সে। ঝোপের ভিতরে ঢুকে ঠং করে কীসে যেন লাগল ওটা। ধাতব কিছুতে।

'কিছু আছে ভিতরে!' আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল

'চলো, গিয়ে দেখি,' মুসা বলল।

'দাঁড়াও!' ওর হাত চেপে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও, দেখি কী হয়? এক মিনিট।'

কিছুই ঘটল না।

'আবার ছুঁড়ি,' বলে পর পর তিনটে মোচা ছুঁড়ল মরিসন। প্রতিটি মোচাই ঝোপের ভিতরে ঢুকে ধাতব জিনিসের গায়ে বাড়ি খেয়ে ঠং করে উঠল।

নতুন কিছু ঘটল না। কোন সাড়াশব্দ নেই, কারও নড়াচড়া নেই।

'চলো,' ঘোষণা করল যেন কিশোর, 'এইবার যাওয়া যায়।'

'একসাথে না থাকাই ভাল,' বব বলল। 'যদি হামলা আসে, সবাই ধরা পড়ব না। কেউ না কেউ পালিয়ে গিয়ে লোকজনকে খবর দেয়ার সুযোগ পাবই।'

কাজেই ছড়িয়ে পড়ে ঝোপটার দিকে এগোল ওরা।

সবার আগে পৌঁছল মরিসন। 'আরে, ঝোপ নয়! জালের গায়ে লতাপাতা লাগিয়ে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করা হয়েছে। ঢেকে রেখেছে কিছু।'

সবাই এসে দাঁড়াল তার পাশে। কিশোর আর মুসা মিলে টেনে সরাতে লাগল জালটা। যা ভেবেছিল কিশোর, ঠিক তা-ই। ঢেকে রাখা হয়েছে সেই ফ্লাইং সসারটা।

'স্বপ্ন দেখছি না তো!' চোখ ডলল ডলি।

'সিঁড়িও নামানো রয়েছে দেখি!' রবিন বলল।

'আমি ঢুকছি,' কিশোর বলল। 'ভিতরে কী আছে দেখা দরকার।'

'না না, কিশোর, যেয়ো না!' অনুরোধ করল মিশা। 'বিপদে পড়বে!'

'আরে না, ভয় নেই। কিছু হবে না।'

'আমিও যাব তোমার সাথে,' মুসা বলল।

'না,' বাধা দিল মরিসন, 'তুমি থাকো। আমি আর কিশোর যাই। যদি কাউকে আসতে দেখো, শিস দিয়ে আমাদের সঙ্কেত দেবে।'

'আচ্ছা। তবে তাড়াতাড়ি করবেন। বেশিক্ষণ থাকবেন না ভিতরে। বলা যায় না…!' বাক্যটা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল সে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে সসারের পেটে ঢুকল কিশোর ও মরিসন। ঢুকেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল।

ফ্লাইং সসার নয় ওটা।

দশ

বেশ কায়দা করে একটা হেলিকপ্টারকে ঘিরে সসারের খোলস পরানো হয়েছে।

'এই, দেখে যাও কাণ্ড!' হেলিকপ্টার থেকে নেমে চিৎকার করে সবাইকে ডাকল কিশোর। 'ভয়ের কিছু নেই। ভিনগ্রহে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না এটা।'

দৌড়ে এল সবাই, বাইরে অপেক্ষা করছিল যারা। অবাক হয়ে দেখল, কীভাবে একটা মস্ত ধাতব চোঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে কপ্টারটাকে। বাষ্প নিশ্চয় তৈরি করা হয় কোন ধরনের স্মোক বম্ব বা ধোঁয়া-বোমা ফাটিয়ে। রঙিন ধোঁয়া বেরোয় ওই বোমা ফাটালে।

হেলিকপ্টারের ভিতরে তল্লাশী চালানোর জন্য ঢুকল কিশোর আর বব। বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের অট্টহাসি শুনতে পেল অন্যেরা। সবুজ মুখোশ খুঁজে পেয়েছে কিশোর, মাথায় ওগুলোর লাল চুল। দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। দুটো মুখোশ তুলে নিয়ে সে একটা পরল, আরেকটা দিল ববকে। তারপর ওই অবস্থায়ই বেরিয়ে এল বাইরে।

হঠাৎ দুটো সবুজ ছেলেকে দেখে আরেকটু হলেই চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল মিশা।

ভিতরে রবারের পোশাকও পাওয়া গেল, যেগুলো পরলে মানুষকে দেখাবে রোবটের মত। আঙুলের মাথায়, আর সবুজ মুখোশের চোখের জায়গায় লাগানো রয়েছে ছোট গোল কাঁচ। রোদ পড়লেই ঝিক করে উঠবে। অথচ এই আলো দেখেই কী ভয়টাই না পেয়েছিল ওরা। আর ওদেরই বা দোষ কী? বড়রাই ভয়ে সব ফেলে পালিয়েছিল।

'আয়না!' বিড়বিড় করল অনিতা। 'অথচ আমরা ভয়েই কাবু! ভাবলাম বুঝি মারণ-রশ্মি! কান মলছি, আর সাইন্স ফিকশন পড়ব না, টিভিও দেখব না!'

'পড়লেও ক্ষতি নেই, দেখলেও না,' মরিসন বলল। 'বিশ্বাস না করলেই হয়।'

আর কী আছে দেখার জন্য আবার গিয়ে হেলিকপ্টারে ঢুকল কিশোর। এবার রবিনকে নিল সাথে। যখন বেরিয়ে এল, হাসি মুছে গেছে।

'ওদের প্ল্যান দেখে এলাম,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'একটা কাগজে লিখে কন্ট্রোলের কাছে রেখে দিয়েছে, কখন কী করবে।'

'পরের বার ওরা যাবে ওয়াটমোরে,' রবিন জানাল। 'আজ বিকেল পাঁচটায়।'

চট করে ঘড়ি দেখল মরিসন। 'দুটো বাজে। লোকগুলো নিশ্চয় লাঞ্চ খেতে গেছে। আমাদের যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'কী করব?' ডলির প্রশ্ন।

'বাধা দেব,' কিশোর বলল।

'কীভাবে?'

'অবশ্যই সুইট সাইডার কোম্পানির মালিককে আটক করে। এই জায়গার মালিক ওই কোম্পানি, এই কপ্টারের মালিকও ওরা।'

'কি করে জানলে?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'লেখা আছে। হেলিকপ্টারের পেটের তলায় উঁকি দিয়ে দেখো, নাম দেখতে পাবে।'

'হ্যাঁ, আছে,' উঁকি দিয়ে দেখে বলল অনিতা। 'আস্ত শয়তান তো ওরা!'

'পাজি লোক,' রবিন দেখে বলল। 'হেলিকপ্টারকে সসার সাজিয়ে শয়তানী করে বেড়াচ্ছে। মেরি কোম্পানিকে নাজেহাল করার জন্য।'

'তাই তো!' মিশা এতক্ষণে বুঝতে পারল। 'আসলেই তো শয়তান। মেরি

করেছে মজা, আর এরা করছে লোকের ক্ষতি।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল ডলি, 'যাতে লোকে মেরিকে ঘৃণা করে, তাদের চকলেট ন খায়।'

'কিনতে শুরু করার আগেই লোকের চোখে ওদেরকে খারাপ বানানোর চেষ্টা!' বব মন্তব্য করল।

'যাই হোক,' কিশোর বলল, 'খেলাটা এখনও শেষ হয়নি। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। নিজেদের জালেই সুইট সাইডারকে জড়াব। চলো।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাসতে আরম্ভ করল সে।

আড়াই ঘণ্টা পর ওয়াটমোরে এসে পৌঁছল লধশরা। ওদেরকে নিয়ে এসেছে মরিসন। এই 'সসার সসার' খেলাটায় সে-ও মজা পাচ্ছে। এর শেষ দেখতে চায়।

শহরে আসার আগেই কয়েকটা টেলিফোন করে নিয়েছে কিশোর। শহরে ঢুকে সোজা চলে এল বড় পার্কটায়। ওখানে অপেক্ষা করছেন শহরের মেয়র, পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট, আর মেরি গো রাউন্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার ব্র্যানডন।

খানিক পর এসে পৌঁছলেন রাশেদ পাশা ও মেরিচাচী। সঙ্গে করে বাবলি আর নিনাকে নিয়ে এসেছেন। বদহজম সেরেছে ওদের, তবে চেহারা এখনও ফ্যাকাসে রয়ে গেছে। অতিলোভের খেসারত। চুপচাপ রয়েছে ওরা।

মেয়রকে পুলিশ সুপারের সঙ্গে পার্কে দেখে কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে এসে ভিড় জমাতে লাগল পথচারীরা। ওরা মনে করল ওয়াটমোরে বুঝি হোমরা-চোমরা কেউ আসছেন।

'মজাটা ভালই জমবে মনে হচ্ছে,' মরিসন বলল।

'তুমি শিওর তো, ওরা এখানেই নামবে?' মেয়র জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হেলিকপ্টারের ভিতরে কাজের যে প্ল্যান দেখেছে সে, তাতে এই পার্কের কথাই লেখা আছে।

আকাশে এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। ঠিক পাঁচটা বাজে।

সামনে এগোলেন মেয়র আর সুপারিনটেনডেন্ট। চুপ হয়ে গেল জনতা।

মুহূর্ত পরেই বিশাল এক ফ্লাইং সসার দেখা গেল আকাশে। রোদে চকচক করছে ওটার গা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জনতা।

আরও কাছে এলে দেখা গেল, ওটার শরীর থেকে ঝুলছে একটা লাল কাপড়, তাতে বড় বড় অক্ষরে সাদা রঙে লেখা রয়েছে: যদি পেট ব্যথায় মরতে চাও, সুইট সাইডার চকলেট খাও।

বোকা হয়ে গেছেন মিস্টার ব্র্যানডন।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো ছেলেমেয়েদের। ব্র্যানডনকে জানাল রবিন, 'বুদ্ধিটা কিশোরের। হেলিকপ্টারের নীচে লাল কাপড়ে লেখা একটা বিজ্ঞাপন আগে থেকেই ছিল, কায়দা করে লুকিয়ে রাখা হয়ে ছিল চোঙের নীচে। তাতে লেখা ছিল সুইট সাইডার চকলেটের বিজ্ঞাপন। কাপড়টার উল্টো পিঠে আমরা নতুন করে ওই লেখাগুলো লিখে লাগিয়ে দিয়েছি। কুকর্মটা যারা করছে,

তারা কল্পনাই করেনি, এরকম কাজ কেউ করে রেখে যেতে পারে। দেখার প্রয়োজন মনে করেনি তাই। আমরা এমন জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে নীচে থেকেই কেবল কাপড় আর লেখাগুলো দেখা যায়. কিন্তু ভিতরে যারা থাকবে তারা কিছু দেখবে না। ভাল করেছি না?' বলে আবার হাসতে লাগল সে।

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ছে জনতাও। ইউ এফ ও-টা যখন ধোঁয়া ছাড়তে আরম্ভ করল, হাসি আরও বাড়ল ওদের। শিস দিয়ে উঠল কেউ কেউ।

ধীরে ধীরে পার্কের মাঝখানে নেমে এল সসার।

'আওয়াজ শুনেই তো বোঝা যায় হেলিকপ্টার,' সুপারিনটেনডেন্ট বললেন। 'লোকে বোঝেনি কেন?'

'কারণ, তখন সাইরেন বাজিয়ে নামত,' বব বলল। 'এখন যন্ত্রটা নষ্ট। আমরাই নষ্ট করে এসেছি, যাতে না বাজে।'

ধীরে ধীরে মই নেমে এল।

'বাবারে!' হাসতে হাসতে বলল এক মহিলা। 'মঙ্গল গ্রহের রাণী এল নাকি?'

কিন্তু রানীও নয়, রাজাও নয়, সসার থেকে নামল চারজন অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষ। আকাশে হাত তুলে আঙুল নাড়ল।

কিন্তু দুপুরের মত আলোকরশ্মি বেরোল না আঙুলের মাথা থেকে। এর কারণ তখন রোদ ছিল, এখন সূর্য চলে গেছে পশ্চিম আকাশে। তার উপর কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। ফলে এই মুহূর্তে রোদও নেই, আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে আলোও ঝিলিক দিল না। যেন আকাশও চলে এসেছে এখন লধশদের পক্ষে, তাদের সাহায্য করার জন্য।

বাঁশি বাজালেন সুপারিনটেনডেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে পার্কের এখান ওখান থেকে ছুটে এল লুকিয়ে থাকা পঞ্চাশজন পুলিশম্যান। ঘিরে ফেলল হেলিকপ্টারটাকে। চারজন সবুজ ভিনগ্রহবাসীকে ধরে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

টান দিয়ে ওদের মুখোশ খুলতেই হুল্লোড় করে উঠল জনতা। দারুণ মজা পাচ্ছে সবাই।

'আরি!' অনিতা বলে উঠল, 'এই চারজনকেই তো পাহাড়ের ওপর দেখেছিলাম! আমাদেরকে ধমক দিয়ে তাড়িয়েছিল।'

'আমার বিশ্বাস পঞ্চমজনও আছে,' কিশোর বলল। 'সে নামেনি। হেলিকপ্টারের পাইলট।'

'ভালমত একহাত নিয়েছ ওদেরকে যা হোক,' মিস্টার ব্র্যানডন লধশদের প্রশংসা করে বললেন। 'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।' চশমা খুলে মুছে আবার ঠিকমত বসালেন নাকের উপর। 'ওহ্হো, তোমাদের পুরস্কার তো বাকিই রয়ে গেছে। তখন ভেবেছিলাম যার যার ওজন মেপে দেব। এখন ভাবছি, সেটা উচিত হবে না। আরও বেশিই পাওনা হয়েছে তোমাদের। এক কাজ করলে কেমন হয়? সারাজীবন আমার কোম্পানি থেকে বিনামূল্যে চকলেট পাবে, যখনই খেতে চাও।'

কী বুঝল টিটু কে জানে। খুশিতে ছাগলের বাচ্চার মত তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে বলল, 'হুফ!' এগিয়ে গিয়ে মিস্টার ব্র্যানডনের হাত চেটে দিতে দিতে বলল,

'হুফ! হুফ! হুফ!'

হেসে তার মাথা চাপড়ে আদর করলেন মিস্টার ব্র্যানডন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও পাবি। আসলে তোর পাওনাই তো সবচেয়ে বেশি। তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলেই না বেরিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলি। তুই ডবল ডবল করে পাবি।'

'বেশি দেবেন না ওকে, আঙ্কেল,' আড়চোখে বাবলি আর নিনার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল। 'খেয়ে পেট খারাপ করে ফেলবে। শেষে বিছানা ছেড়ে ক'দিন আর উঠতে পারবে না। কিছু বাচাল মেয়ের মত টিটুটাও অতিরিক্ত লোভী।'

মিস্টার ব্র্যানডন হাসলেন। লধশরা মুসার কথার মানে বুঝে হাসল। আর বাবলি, নিনা মুখ কালো করে ফেলল। দাঁতে দাঁত চেপে বাবলি বলল, 'এর বদলা না নিয়েছি তো আমার নাম বাবলি নয়! আয় নিনা, যাই!'

গটমট করে কিশোরদের ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল দু'জনে।

***

মুকুটের খোজে তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দিন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

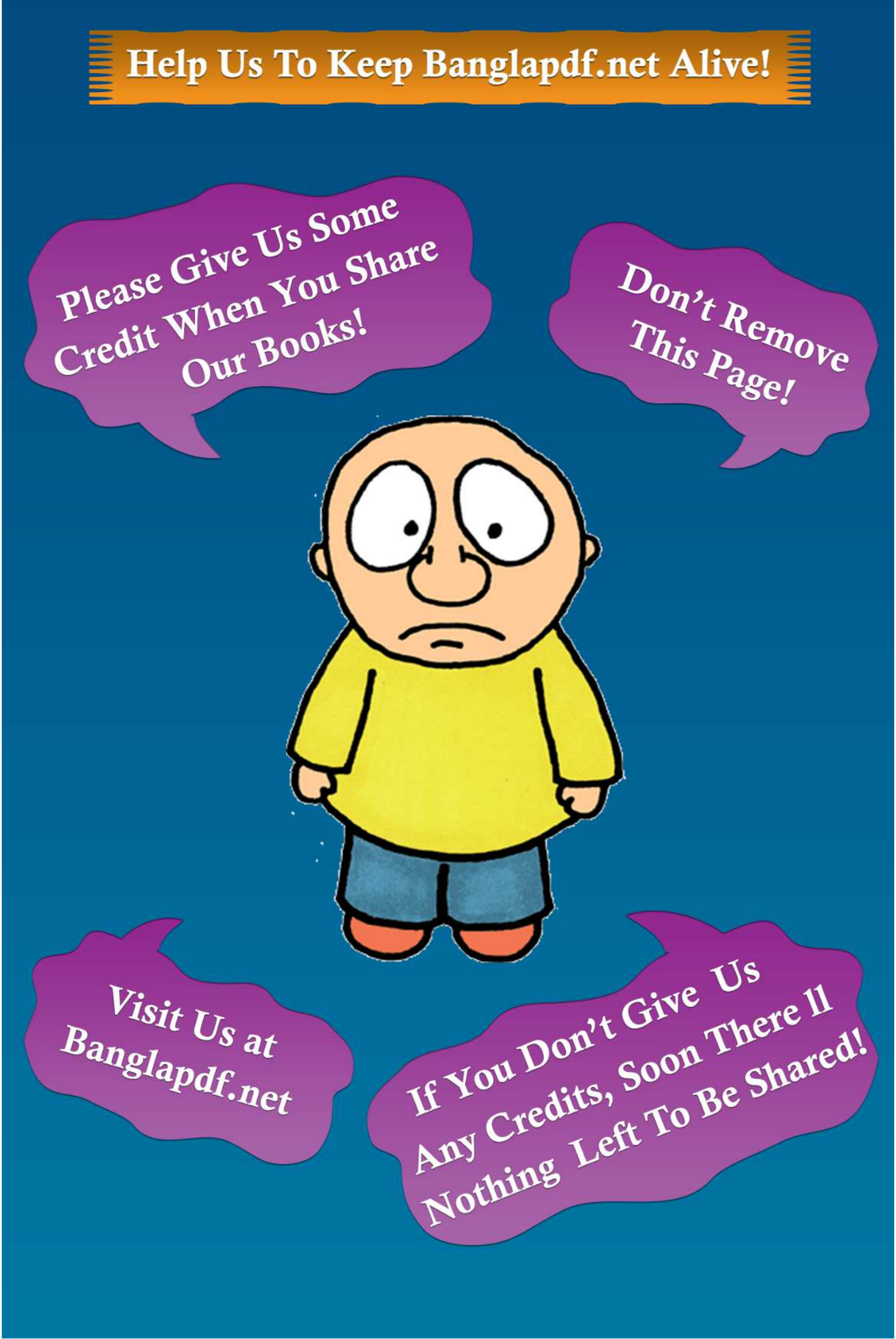
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মুকুটের খোঁজে তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

'খাইছে! একসঙ্গে ন-য়-টা!' অবাক হলো মুসা। এইমাত্র লেটারবক্স থেকে খামগুলো বের করে নিয়ে নিজেদের রুমে এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। 'খামগুলো একই রকম, তবে হাতের লেখা আলাদা।

তিনটে কিশোরের, তিনটে রবিনের আর তিনটে আমার।'

'নিমন্ত্রণপত্র নাকি?' সাগ্রহে বলল কিশোর। জবাবের অপেক্ষা না করে বন্ধুর হাত থেকে নিজেরগুলো নিয়ে একটা ছিঁড়তে শুরু করল। 'হ্যাঁ, নিমন্ত্রণই। কার্ডের সঙ্গে চিঠিও আছে দেখছি।'

এক নিঃশ্বাসে ওটা পড়ে ফেলল কিশোর। তারপর চোখ কপালে তুলে বলল, 'সর্বনাশ! নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাকে বিচারক করা হয়েছে!'

'অ্যাঁ?' অবিশ্বাসে চোয়াল ঝুলে গেল রবিনের। 'সত্যি?'

'পৃথিবীর নানা দেশের শিশু কিশোরদের নিয়ে প্রতি বছরের মত এবারও নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে,' চিঠিতে চোখ রেখে বলল কিশোর। 'সেখানে এশিয়ার অনেক প্রতিযোগীও থাকবে।'

এবার রবিন ওর একটা খাম খুলতে শুরু করল। একই জিনিস পেয়েছে ও।

দাঁত বের করে হাসল রবিন। 'আমাকেও বসতে হবে তোমার পাশের চেয়ারে।'

'ইয়াল্লা!' মুসা ওর চিঠি পড়ায় মন দিল। 'আমাকেও বাদ রাখেনি দেখছি!'

'কেউ আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে মনে হয়!' কিশোরের কণ্ঠে ঘোর সন্দেহ। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ, মেরিচাচীর দূরসম্পর্কের বোন। কিশোরকে ভীষণ স্নেহ করেন। মিসেস ম্যাডোনা জানতে চাইলেন তাঁর কোন চিঠি আছে কিনা। হতাশ হতে হলো তাঁকে। ক্যালিফোর্নিয়ায় লেখাপড়া করে তাঁর একমাত্র ছেলে ববি লোপেজ। চিঠি লেখায় তার ভীষণ অনীহা।

মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ সম্প্রতি একটা মোটেল দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের অন্যতম টুরিস্ট স্পট নিউপোর্ট বীচে। 'সীগাল মোটেল'।

বিধবা মহিলাকে মোটেল দেখাশোনায় সহায়তা করছেন তাঁর ছোট ভাই ফরস্কিন। কিছুদিন আগে রকি বীচে বোনের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিসেস ম্যাডোনা। গরমের ছুটি চলছিল কিশোরদের। কিশোরকে তাঁর নতুন মোটেল

দেখার প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল ও।

হাতে কোন কাজ ছিল না। শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে হাতেপায়ে জং ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। নিউপোর্ট বীচ জায়গাটা দেখার মত—জানা ছিল কিশোরের। আর বোনাস হিসেবে একটা রহস্য যদি জুটে যায়...। তাই সদলবলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি কিশোর।

এখানে এসে কয়েকজন গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে কিশোরদের। নিউপোর্ট কালচারাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তাঁদের একজন।

মিসেস ম্যাডোনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে মহিলার. সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছে কিশোরদের সঙ্গে। কালচারাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফিয়োনা জনসন আগে থেকেই জানতেন কিশোরদের নাম। শুধু জানতেন বললে কম বলা হয়, তিন গোয়েন্দার রীতিমত ভক্ত তিনি।

অনেক দিন থেকেই মিসেস ম্যাডোনাকে অনুরোধ করে আসছিলেন তিন গোয়েন্দাকে নিউপোর্ট বীচে দাওয়াত করে নিয়ে আসতে। ওদের মেধার ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ বলেই অনুষ্ঠানে বিচারক হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওখানে যারা বিচারক থাকবে, তারা সবাই কিশোরদের বয়সী।

'আমাদের নামে নয়টা চিঠি এসেছে, আন্টি,' জানাল কিশোর। আরও জানাল. 'তিনটে খামের ওপর ঠিকানা লিখেছে একই লোক। বাকি ছয়টার ঠিকানা লিখেছে অন্য কেউ। দাঁড়ান, খুলে দেখি।'

সোৎসাহে বাকি খামগুলো খুলতে লাগল তিন বন্ধু।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদের চঞ্চল হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যাডোনা।

দেখা গেল ছয়টা খামে একই জিনিস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র। চিঠি নেই কোনটাতেই।

অবাক হলেন মিসেস ম্যাডোনা। বললেন, 'তিনজনকে এতগুলো কার্ড পাঠানোর কি দরকার ছিল?'

মুসা আর রবিন একযোগে শ্রাগ করল। রবিন বলল, 'ভুল করে পাঠিয়েছে, মনে হয়।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোন রহস্য আছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে বলল গোয়েন্দা-প্রধান। 'ফিয়োনা জনসনকে ফোন করতে হবে,' মিসেস লোপেজের দিকে ফিরল ও। 'আন্টি, আমরা অনুষ্ঠানে যেতে পারি?'

'পারো,' হাসলেন ম্যাডোনা লোপেজ। 'একজন গুণী মানুষ তোমাদের সম্মান করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কেন যাবে না?'

তিন বন্ধু ছুটল নিউপোর্ট কালচারাল সোসাইটির অফিসে।

মিসেস ফিয়োনাকে পাওয়া গেল তাঁর অফিসে। বয়স ষাটের ওপরে হলেও দেখে বোঝার উপায় নেই। এখনও যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পৈতৃক সূত্রে অগাধ সম্পত্তির মালিক। নিজ হাতে বানানো কফি পরিবেশন করলেন ওদের ফিয়োনা।

'কি, আসছ তো অনুষ্ঠানে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'অবশ্যই,' মুসা জবাব দিল। টেবিল চাপড়াতে গিয়েও থেমে গেল।

'এ তো আমাদের জন্যে বিরাট সম্মানের ব্যাপার, ম্যাম,' কিশোর বলল। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আমাদের প্রত্যেকের কাছে তিনটে করে কার্ড পাঠানো হয়েছে কেন?'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল বৃদ্ধার। 'তিনটে? না তো! এমন হওয়ার তো কথা নয়!'

টেবিলে নিজের চিঠিগুলো রাখল কিশোর, মুসা আর রবিনও রাখল ওদেরগুলো। অবাক হয়ে কিশোর খেয়াল করল মুসার একটা চিঠি নেই। তিনটের জায়গায় দুটো।

'আরেকটা কই?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে কিশোর তাকাল বন্ধুর দিকে।

বোকার মত চেহারা হলো মুসার। 'হাতেই তো ছিল,' বলল অপ্রস্তুত কণ্ঠে। 'গেল কোথায়?'

'পড়ে গেছে?'

'মনে হয়।'

মিসেস ম্যাডোনার যে গাড়িটা নিয়ে ওরা এসেছে, সেটা অফিসের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে।

মুসা ছুটল সেদিকে।

গাড়ির ড্যাশবোর্ড, সীট, লকার—সব চেক করে দেখল মুসা।

নেই। বিফল হয়ে ফিরে এল ও।

মিসেস ফিয়োনার অনুমতি নিয়ে আন্টির বাসায় ফোন করল কিশোর। ধরল হাউজকীপার বেটি হারপার। জানাল, ওরা বেরিয়ে যাবার পর ওয়েস্টবাস্কেটের কাছে একটা খাম পড়ে থাকতে দেখে সে। অদরকারী মনে করে অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে ওটাও পুড়িয়ে ফেলেছে।

'আসলে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ওটা কখন হাত থেকে পড়ে যায়, খেয়ালই করিনি,' বলল মুসা।

'ওটা নিশ্চয়ই তেমন মূল্যবান কিছু নয়,' বললেন ফিয়োনা।

'কিন্তু ম্যাম,' মুসা বলল শুকনো কণ্ঠে। 'নয়টা খামের রহস্য বোঝা যাচ্ছে না।'

যে তিনটে খামের মধ্যে আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে চিঠি আছে, ফিয়োনা সেগুলোকে আলাদা করে বললেন, 'এগুলো পাঠানো হয়েছে আমাদের অফিস থেকে। হাতের লেখাটা মিসেস বুনের। বাকিগুলো অন্য একজনের লেখা, তবে কার বলতে পারব না, সরি।'

এরপর টেলিফোনে মিসেস বুনের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। আসতে বললেন তাঁকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন মিসেস বুন।

খামগুলো তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো এগুলো কে পাঠিয়েছে!'

'আমাদের অফিস থেকে পাঠানো হয়নি, ম্যাম,' বেশ কিছুক্ষণ হাতের লেখাটা পরীক্ষা করে জানালেন মিসেস বুন।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' অবাক কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। 'কার্ড বাইরে গেল কিভাবে?'

'বলতে পারব না।'

'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ,' পরে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

বেরিয়ে গেলেন মিসেস বুন।

দুই

পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠল কিশোর।

হাতমুখ ধুয়ে খামগুলো নিয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসল। একটা খাম থেকে নিমন্ত্রণপত্র বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ একটা অতিরিক্ত 'C' চোখে পড়ল ওর। আগে ছিল না বর্ণটা।

উত্তেজিত হয়ে উঠল গোয়েন্দা প্রধান।

পরের লাইনগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল। এবং পেয়েও গেল। আরেকটা অতিরিক্ত বর্ণ 'W' আবিষ্কার করল এবার।

এর মধ্যে বিছানা ছেড়েছে মুসা। হাতমুখ ধুয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল, 'খাইছে! সাত সকালে কি করছ ওগুলো নিয়ে?' কিশোরের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

'নয়টা চিঠির রহস্য মনে হয় ভাঙতে পারব আমরা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'মনে হয় সূত্র পেয়ে গেছি।'

এর মধ্যে রবিনও জেগে উঠেছে। মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

'সূত্র?' অবাক হলো রবিন। 'কিসের সূত্র?'

রবিন আর মুসাকে নতুন জেগে ওঠা বর্ণদুটো দেখাল কিশোর। কার্ডটা নিয়ে দেখতে গিয়ে আরেকটা 'S' পেয়ে গেল রবিন।

'কিন্তু,' বলল ও। 'এই সি, ডব্লিউ এবং এস দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে? তোমার মাথায় খেলছে কিছু?'

'আপাতত না। সবগুলো কার্ড ভাল করে দেখতে হবে আগে।'

'আগে খেয়ে নিই,' পেটের ওপর হাত বুলিয়ে বলল মুসা। 'খিদে পেয়েছে খুব।'

নাস্তা সেরে আবার কার্ডগুলো নিয়ে বসল তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে মিসেস ম্যাডোনাও যোগ দিয়েছেন।

আরও সাতটা অতিরিক্ত বর্ণ খুঁজে পেল ওরা, যেগুলো আগে ছিল না–একটা করে R, T, E, L, W আর দুটো O। অনেক মাথা খাটানোর পর এগুলো দিয়ে দুটো শব্দ দাঁড় করিয়ে ফেলল ওরা–STOLE CROW।

'অতিরিক্ত "W"টা দিয়ে তাহলে কি বোঝানো হচ্ছে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। মিসেস ফিয়োনাকে ফোন করল ও। ব্যাপারটা বলল।

কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারলেন না তিনি। 'কিশোর,' বললেন ফিয়োনা।

'আজ বিকেলে তোমরা আমার বাসায় একটু বেড়িয়ে গেলে খুব ভাল হয়।

একটু ভেবে নিয়ে কিশোর বলল,'পারব। কিন্তু–'

'এখন বলা যাবে না,' ওর কথা কেড়ে নিয়ে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা। 'এলে পরে বলব। আসছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনেগুলো ইভেন্ট থাকবে,' কিশোরদের উদ্দেশে বললেন মিসেস ফিয়োনা। 'তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্টটি হচ্ছে জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার। সৌন্দর্য, পোশাক-আশাক, রুচি আর মেধার মাপকাঠিতে নির্বাচিত হবে জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার। যে কোন দেশের যে কেউ পেতে পারে এই সম্মান। আর তাকে সম্মানটা আমরা জানাব বিশেষ একটা উপহার দিয়ে। তোমাদের কথা দিতে হবে এই উপহারের ব্যাপারটা গোপন রাখবে। কাউকে কিছু বলা চলবে না। পারবে?'

নীরবে মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর, বলবে না কাউকে।

'কেন পারব না?' বলে টেবিল চাপড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। কিছুদিন থেকে নতুন বাতিকে পেয়েছে ওকে–কথায় কথায় টেবিল চাপড়ানো।

কিশোরদের ভেতরের একটা রুমে নিয়ে গেলেন মিসেস ফিয়োনা। তালাবদ্ধ একটা কেবিনেটের সামনে এসে থামলেন তিনি। হাতের পাউচ থেকে চাবি বের করে দরজা খুললেন।

একযোগে উঁকি দিল ছেলেরা। চমৎকার একটা মুকুট দেখতে পেল ওরা।

'ইয়াল্লা!' বিষম খাওয়ার জোগাড় হলো মুসার। 'এত সুন্দর!'

'কোত্থেকে কিনেছেন?' মুগ্ধ চোখে ঝলমলে মুকুটটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

'হংকং-এর এক অকশন থেকে,' জানালেন মিসেস ফিয়োনা। 'প্রাচীন চীনের কোন এক জমিদারের ছিল এটা। কি যেন নাম তাঁর–নাহ্, মনে পড়ছে না। এটার জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয়েছে আমাকে। কাজটা করা হয়তো বোকামিই হয়ে গেছে।'

'শখের তোলা আশি টাকা!' বিড়বিড়াল রবিন।

এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। দ্রুত কেবিনেটের দরজা বন্ধ করে মিসেস ফিয়োনা তিন অতিথিকে নিয়ে ফিরে এলেন ড্রইং রুমে।

'এ হচ্ছে স্টেলা ফোর্ড,' আগন্তুকের সঙ্গে কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। 'এর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যেই আসলে আসতে বলেছিলাম তোমাদের। আলী দ্য গ্রেট স্কুলে পড়ে ও। শিকাগো থেকে এসেছে আমাদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে।–আর স্টেলা, এরা হচ্ছে কিশোর, রবিন আর মুসা। শখের গোয়েন্দা।'

স্টেলা হ্যান্ডশেক করল ওদের সঙ্গে।

মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী। নীলচে চোখদুটো ঝিক্‌মিক্ করছে সারাক্ষণ। মাঝ পিঠ পর্যন্ত নেমে আসা রেশমের মত চুল পনিটেইল করে বাঁধা। এক নজর দেখেই

কিশোর বুঝতে পারছে চলন-বলনে মেয়েটা দারুণ স্মার্ট। আর বন্ধুসুলভ। জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার হওয়ার যোগ্য।

যে কারণেই হোক, স্টেলা যে বেশ উদ্বিগ্ন, তা ওর চেহারা দেখেই বুঝে ফেলল তিন গোয়েন্দা।

সত্যি উদ্বিগ্ন কিনা কিশোর জানতে চাইলে মেয়েটা বলল, 'এক অচেনা লোক ফোন করেছিল আমাকে। বলেছে আমি যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে সরে না দাঁড়াই, তাহলে কপালে খারাবি আছে আমার। যেভাবে হোক ওরা আমাকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেবে না বলে জানিয়েছে।'

'বলো কি!' রবিন অবাক হলো।

'সাজ্ঘাতিক কাণ্ড!' বলল মুসা।

কিছু না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

মিসেস ফিয়োনাকে অবশ্য তিন গোয়েন্দার মত অত চিন্তিত দেখাল না। স্টেলার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে বললেন, 'আমার মনে হয় কেউ ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে।'

একমত হতে পারল না কিশোর। অবশ্য ফিয়োনা জনসনের কথা স্টেলাকে বেশ আশ্বস্ত করেছে বলে মনে হলো।

কিশোর তাই ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে পরেও চিন্তা করা যাবে।

'আমরা এখন উঠব,' বলল ও।

'আমিও,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল স্টেলা। হাতে ধরা একটা বই মিসেস ফিয়োনার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'ম্যাম, একটা বই সংগ্রহ করে দিতে বলেছিলেন না সেদিন? সেটা।'

বইটা নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন বৃদ্ধা।

'চলো, তোমাকে নামিয়ে দিই,' বলল কিশোর। 'যাবে কোথায়?'

'ঈগল স্টার মোটেলে। তোমাদের অসুবিধে হবে। থাক।'

'কি যে বলো!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল গোয়েন্দা-প্রধান। 'কিসের অসুবিধে? চলো চলো।'

মিসেস ফিয়োনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

গন্তব্যে পৌঁছতে বিশ মিনিটের মত লাগল। বড়সড় পার্কিং লটের এক কোনায় গাড়ি পার্ক করল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত দু'দিকের জানালায় উদয় হলো দুটো অপরিচিত মুখ।

'স্টেলা ফোর্ড!' প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল তাদের একজন। 'বেরিয়ে এসো!'

তিন

'না!' চেঁচিয়ে উঠল স্টেলা।

কিশোর বুঝল পরিস্থিতি সুবিধের নয়। ইগনিশন অন করল ও।

পরক্ষণে দ্রুত বেগে গাড়িটা পিছিয়ে যেতে লাগল। সময়মতই লোকদুটো লাফিয়ে সরে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড পর মোটেলের মূল গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দ্রুত দরজা খুলল স্টেলা। লাফিয়ে নেমে পড়ল। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তিন গোয়েন্দাও নেমে পড়ল দ্রুত।

মোটেলের অ্যাটেনডেন্টকে সব জানাল স্টেলা।

'এখনই পুলিশে খবর দেয়া উচিত,' ঢোক গিলে বলল অ্যাটেনডেন্ট। 'দাঁড়াও, ফোন করছি অফিসে।'

মোবাইলে যোগাযোগ করল সে অফিসের সঙ্গে। ওদের বলল, শীঘ্রিই যেন পুলিশে খবর দেয়া হয়। নিরাপত্তার জন্যে আরেকজন অ্যাটেনডেন্টকে পাঠাতে বলে লাইন কেটে দিল।

কিশোর, রবিন আর মুসাকে নিয়ে ওর রুমে চলে এল স্টেলা। খুব ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। আর্ণী দ্য গ্রেট স্কুল থেকে আরও তিনটে মেয়ে এসেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। স্টেলার ফ্লোরে অন্য রুমে আছে ওরা।

রুমে ঢুকেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টেলা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'অমন কুৎসিত চেহারার মানুষ কখনও দেখিনি আমি।'

'আসলেই ভয়ঙ্কর চেহারা ব্যাটার,' সায় দিল কিশোর।

'জাত ক্রিমিনাল,' রবিন যোগ করল।

বিছানায় উঠে বসল স্টেলা।

'স্টেলা, তুমি ওদের চেনো?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'না।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে চেনে। নামও জানে।'

'ওই জঘন্য চেহারার লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি,' শ্রাগ করে বলল ও। 'সঙ্গের কোট পরা লোকটাকেও না।'

আচমকা রুমের দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকেছে স্টেলার বয়সী এক মেয়ে।

'কিশোর,' ওর দিকে ঘুরল স্টেলা। 'এ হলো আমার ক্লাসমেট–রিয়া মর্টন।' বান্ধবীর দিকে ফিরল ও। 'রিয়া, এরা কিশোর, মুসা আর রবিন, আমার নতুন বন্ধু। ওদের একটা বড় পরিচয় আছে...।'

'জানি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল রিয়া। 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি গর্বিত।' সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

রিয়া মেয়েটি হাসিখুশি আর বন্ধুবৎসল। প্রথম দেখাতেই বুঝে ফেলল তিন গোয়েন্দা।

সহপাঠীকে সব জানাল স্টেলা।

'কি চায় ওরা?' কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল রিয়া।

নীরবে কাঁধ উঁচু করে ছেড়ে দিল স্টেলা।

'কিডন্যাপার?' চিন্তিত দেখাল রিয়াকে।

চিন্তাটা কিশোরের মাথায়ও ঘুরছে অনেকক্ষণ থেকে।

'আমাকে কেউ কিডন্যাপ করতে চাইবে কেন?' শুকনো কণ্ঠে বলল স্টেলা। 'কি লাভ আমাকে কিডন্যাপ করে?'

'এখন থেকে একা বাইরে কোথাও যেয়ো না,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'বেরোলে দল বেঁধে বেরোবে।'

'ঠিক বলেছ,' রিয়া বলল। 'আমি ওর দিকে খেয়াল রাখব, তোমরা চিন্তা কোরো না, কেমন?'

বাসায় ফিরে এল ছেলেরা।

মিসেস ফিয়োনার ওখানে চীনা জমিদারের প্রাচীন মুকুট থেকে শুরু করে ঈগল স্টার মোটেলে ঘটে যাওয়া ঘটনা পর্যন্ত সব বলল ওরা মিসেস ম্যাডোনা লোপেজকে।

'কি সাঙ্ঘাতিক!' মন্তব্য করলেন তিনি। 'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আবার বিপদ ঘটিয়ে বোসো না যেন।'

নীরবে মাথা দোলাল ওরা।

পালা করে মুসা আর রবিনকে দেখল কিশোর। তারপর বলল, 'এসো, কার্ডগুলো আরেকবার ভাল করে দেখি। আমার মনে হয় আরও কোন সূত্র লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে।'

নিজেদের রুমে চলে এল তিন গোয়েন্দা। নিমন্ত্রণপত্র থেকে পাওয়া বর্ণগুলো নিয়ে যে দুটো শব্দ দাঁড় করিয়েছে ওরা, সেগুলো নিয়ে ভাবতে বসল।

STOLE CROW

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের দু'চোখ। উত্তেজনা বেড়ে গেল। একবার মুসা একবার রবিনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর নজর।

'খাইছে!' বোকার মত চেহারা হলো মুসার।

'যা বলতে চাইছ বলে ফেল,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল রবিন।

'STOLE CROW না হয়ে,' থামল কিশোর দুই সহকারীর উত্তেজনা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে। তারপর বলল, 'STOLEN CROWN হতে পারে না?'

'পারে!' খুশিতে ঝিকিয়ে উঠল রবিনের চোখ।

'এবং সেটা হওয়ার সম্ভবনাই বেশি,' মুসা যোগ করল।

'না, মুসা,' হাসল কিশোর। 'অতটা নিশ্চিত হওয়া যাবে না, যতক্ষণ না আরও দুটো N পাওয়া যায়।'

কিছুক্ষণ কার্ডগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর কাঙ্ক্ষিত N দুটো পেয়ে গেল ওরা। অথচ আগে ছিল না বর্ণদুটো।

'কথাটা তাহলে STOLEN CROWN বা CROWN STOLEN-এর যে কোন একটা হতে পারে,' তীক্ষ্ণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি বলো?'

'ঠিক,' সমর্থন জানাল কিশোর। 'এর সঙ্গে ফিয়োনা জনসনের মুকুটের কোন

সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় তোমাদের?'
'থাকতে পারে,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল মুসা।
এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ওদের সুবিধের জন্যে ড্রইং রুমের টেলিফোন সেটটা কিশোরদের রুমে দিয়ে গেছেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ।
রিসিভার তুলল মুসা। 'হ্যালো?'
'তুমি কিশোর? রবিন? নাকি মুসা?' ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা গমগমে পুরুষ কণ্ঠ।
'মুসা…আপনি…'
'তোমাদের গাড়ির লাইসেন্স নম্বর কি TXU-53-74?'
এমন একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না মুসা। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'কিন্তু…আপনি…'
জবাব এল না। রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ এল মুসার কানে।
মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ ঘরে ঢুকলেন এসময়। 'কার ফোন?' জানতে চাইলেন।
আজব কলটার কথা জানাল মুসা। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা। সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমে যোগাযোগ করলেন ডিউটিরত লোকটির সঙ্গে। চিন্তা করতে মানা করল লোকটি। জানাল এক্ষুনি সে বাইরে দু'জন গার্ড পাঠাচ্ছে তাঁর গাড়িটি দেখে রাখতে।
'থ্যাঙ্ক ইউ,' বললেন ম্যাডোনা। 'শুনুন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।'
'আচ্ছা,' বলল সে।

সেন্ট পলস্ স্ট্রীট।
এই রোডেই মিসেস ফিয়োনা জনসনের বাড়ি। বাড়ির নামটা বেশ কাব্যিক।
'ইউটোপিয়া'–মানে, স্বপ্নরাজ্য।
আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল বলে বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে।
STOLEN CROWN বা CROWN STOLEN-এর সঙ্গে তাঁর মুকুটের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এব্যাপারে ফিয়োনার কি ধারণা সেটা জানার জন্যেই তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে তিন গোয়েন্দা।
কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রমহিলা। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'STOLEN CROWN! মানে চোরাই মুকুট! অসম্ভব! কিছুতেই ওটা চোরাই মুকুট হতে পারে না! তোমাদের আগেই বলেছি অনেক টাকায় কিনেছি ওটা। তবে…তবে…' সোজা হয়ে বসলেন তিনি। উত্তেজনায় কাঁপছেন। 'তবে ওটা যদি সত্যি চোরাই মুকুট হয়ে থাকে সাগরে ভাসিয়ে দেব।'
'না না, ম্যাম!' হাত তুলে বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'চোরাই মুকুট বলতে যে আপনারটাই বোঝানো হয়েছে এমন কোন কথা নেই।'
'দুনিয়ায় আরও অনেক মুকুট আছে,' যোগ করল রবিন।
'হংকং-এর এক অকশন থেকে ওটা কিনেছিলাম,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন

ফিয়োনা জনসন। 'ওটার প্রতি অনেকেরই আগ্রহী ছিল কিন্তু দাম যতই চড়তে লাগল আগ্রহও কমে যেতে লাগল ওভ। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল, দাম হেঁকে চললাম শুধু আমি আর আমেরিকাবাসী এক চীনা। মুকুটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল নিঃসন্দেহে। তাই বলে যে অস্বাভাবিক দাম দিয়ে আমি ওটা কিনেছিলাম তা কেবল আমার ক্ষমতা ছিল বলেই নয়, ওই চীনা লোকটিকে হারানোর জন্যে রীতিমত ক্ষেপে উঠেছিলাম আমি। বলতে পারো জেদের বশেই কিনেছিলাম মুকুটটা।'

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা। জেদের বশে ওটার মালিক হয়ে যে তিনি ভাল করেননি বুঝতে পারছে ওরা।

'আচ্ছা, ম্যাম,' বলল কিশোর। 'কেনার আগে নিশ্চই মুকুটটা ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি শিওর আপনার কাছে এখন যেটি আছে সেটি অকশন থেকে কেনা ওই মুকুটই?'

'হ্যাঁ,' বললেন ফিয়োনা জনসন। 'ওটা কেনার পর আর কারও হাতে দেইনি। এমন কি তোমরা ছাড়া আর কাউকে দেখাইনি পর্যন্ত। বাড়ি ফিরে নিজের হাতে রেখে দিয়েছি ওই কেবিনেটের মধ্যে।'

'এমন যদি হয়,' কিশোর বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে। 'ওটা চুরি হয়ে গেছে!'

'তাহলে যেটা আমার কেবিনেটে আছে, সেটা?'

'নকল!'

'অসম্ভব!' বলেই লাফিয়ে উঠে পড়লেন মিসেস ফিয়োনা। 'আমি কেনার আগে এবং পরেও দেখেছি ওটার দু'পাশে দুটো লম্বাটে পাথর বসানো আছে। বাঁ পাশেরটা সামান্য ছোট। একমাস হলো কিনেছি ওটা। এর মধ্যে যতবার দেখেছি ততবারই চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। এসো, দেখবে তোমরা।'

ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরের রুমে চলে এলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালাগুলো বন্ধ আছে কিনা চেক করে দেখলেন। তারপর পাউচ থেকে চাবি বের করে কেবিনেট খুললেন।

মুকুটটা বের করে কেবিনেটের ওপর রাখলেন। জ্বালিয়ে দিলেন রুমের সবক'টা বাতি। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল ওটা।

দেখা গেল মুকুটটার দু'পাশে দুটো পাথর বসানো আছে ঠিকই, কিন্তু দুটোই সমান। অথচ মিসেস ফিয়োনার কথা অনুযায়ী বাঁ পাশেরটা একটু ছোট হওয়ার কথা।

একযোগে মিসেস ফিয়োনার দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ধপাস করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'চুরি হয়ে গেছে! চুরি হয়ে গেছে আমার সাধের মুকুট!'

'আপনি যেহেতু মুকুটটা আমাদের ছাড়া আর কাউকে দেখাননি কাজেই ধরে নেয়া যায় ওই চীনাই লেগেছিল ওটার পিছনে,' বলল কিশোর মিসেস ফিয়োনার উদ্দেশে। 'ওই ব্যাটাই আসলটা সরিয়ে নকলটা রেখে গেছে।'

শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছেন ফিয়োনা। কোন কথা বলতে পারলেন না।

'হতে পারে,' মুখ খুলল রবিন। 'কিন্তু আসলটা ছাড়া নকলটা বানানো সম্ভব নয়। এজন্যে প্রথমে আসলটা চুরি করে ওটার নকল বানিয়ে জায়গামত রেখে আসার জন্যে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এত সময় কোথায় পেল চোর? তার কি ভয় ছিল না এই সময়ের মধ্যে মিসেস ফিয়োনা কেবিনেট খুলতে পারেন?'

'তোমার প্রশ্নের দুটো জবাব আছে,' কিশোর বলল একটু ভেবে নিয়ে। 'সত্যিই হয়তো ওই সময়টায় কেবিনেট খোলেননি মিসেস ফিয়োনা। আর দ্বিতীয় জবাব হলো ওই সময়ে হয়তো বাড়ি থেকে দূরে কোথাও ছিলেন তিনি।' বলে সে তাকাল ফিয়োনা জনসনের দিকে।

'হ্যাঁ!' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক চিরে। 'গত সপ্তাহে পুরো পাঁচদিন শহরের বাইরে ছিলাম।'

যা বোঝার বুঝে গেছে তিন গোয়েন্দা।

'তা এখন কোথা থেকে তদন্ত শুরু করব আমরা?' কিশোরকে প্রশ্ন করল মুসা।

'প্রথমেই জানতে হবে ওই ব্যাটা চোরের নাম-ঠিকানা,' জবাব দিল কিশোর। ফিয়োনার দিকে ফিরল সে। 'লোকটার নাম কি, ম্যাম? থাকে কোথায়?'

'যত দূর মনে পড়ে সে বলেছিল এই নিউ ইয়র্কেই থাকে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি। নামটা মনে পড়ছে না…সরি।'

মোটেলে ফিরে এল তিন কিশোর। মিসেস ম্যাডোনা ওদেরকে খাইয়ে শুয়ে পড়লেন।

আবার নিমন্ত্রণপত্রগুলো নিয়ে বসে পড়ল ওরা।

আরও দুটো বর্ণ উদ্ধার করল রবিন আর মুসা। G আর X। আগের একটা W এখনও অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

'এই তিনটে বর্ণ দিয়ে তো গ্রহণযোগ্য কোন শব্দ হয় না,' কিশোর বলল। তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, বাকি শব্দগুলো ওই কার্ডে ছিল।'

কিশোর কি বলতে চাইছে বুঝতে পেরে চেহারা লাল হয়ে উঠল মুসার। 'সরি।'

'আর সরি সরি করতে হবে না,' লম্বা করে হাই তুলল রবিন। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।

কিশোরের অবস্থাও এক। চোখ কট্‌কট্‌ করছে। খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

পরদিন সাত সকালেই ঘুম ভাঙল ওদের। কিছুক্ষণ পর টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন করেছেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। জানালেন রাতে ঘুমাতেই পারেননি তিনি মুকুটের শোকে। তারপর জানালেন আসল কথা। অনেক কষ্টে লোকটির নাম মনে করতে পেরেছেন: ইয়াঙ জিঙ।

'তার নিউ ইয়র্কের ঠিকানা মনে করতে পেরেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'আরে না! নাম স্মরণ করতেই জান শেষ!'

'ব্যাটার পাসপোর্ট না থেকেই পারে না,' কিশোর বলল। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শীঘ্রি আমরা তার ঠিকানা বের করে ফেলব। থ্যাঙ্কস, ম্যাম, ফর কলিং আস।' রিসিভার রেখে দিল কিশোর।

ইয়াঙ জিঙের কথা মিসেস ম্যাডোনাকে জানাল কিশোর। তিনি জানালেন লোকটির ঠিকানা জোগাড় করার যতটা সম্ভব চেষ্টা করে দেখবেন। তারপর নিজের রুমে গিয়ে একের পর এক ফোন করতে লাগলেন।

এদিকে কিশোররা নতুন কোন বর্ণ পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারছে না। মিসেস ম্যাডোনা কোন তথ্য জোগাড় করতে পারলেন কিনা সে চিন্তা কাজে মন বসাতে দিচ্ছে না।

একসময় ফিরে এলেন ম্যাডোনা আন্টি। মুখে হাসির ছটা।

'কিছু জানতে পারলেন, আন্টি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। ওয়াশিংটনের পাসপোর্ট অফিসে চাকরি করে আমার এক পরিচিত লোক। নাম জেমস হাওয়ার্ড। সে জানাল ইয়াঙ জিঙ নামের অনেক পাসপোর্টধারী আছে নিই ইয়র্কে।'

'কিন্তু,' হতাশ হয়ে বলল রবিন। 'অনেক ইয়াঙ জিঙকে তো আমাদের দরকার নেই, আন্টি।'

'আমাদের চাই ওই ক্রিমিনাল ইয়াঙ জিঙকে,' মুসা বলল।

'আরে বোকা, আসল কথাটা এখনও বলিনি,' হাসি চওড়া হলো মিসেস ম্যাডোনার। 'ওই ইয়াঙ জিঙদের একজন থাকে নিউপোর্ট বীচে।'

'তাই নাকি!' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'এরপর তোমরা কি করতে চাও?' জানতে চাইলেন ফিয়োনা।

কিছু না বলে কিশোর টেলিফোন সেটের পাশে রাখা ফোনবুকটা তুলে নিয়ে ইয়াঙ জিঙের নম্বর খুঁজতে লাগল।

পেয়েও গেল শীঘ্রি। 'পুরো নাম ডক্টর ইয়াঙ জিঙ,' বলল ও কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে। 'কিন্তু কি ধরনের ডাক্তার তা লেখা নেই।'

'পুলিশের সাহায্য নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা।

কিশোরের মনে ধরল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল পুলিশে। জানা গেল ডক্টর ইয়াঙ জিঙ একজন প্রফেসর।

'লাঞ্চের আগে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, চলো,' প্রস্তাব করল

রবিন।

'আমি মোটামুটি শিওর এই জিঙ সেই জিঙ নন,' বলে একটা চিরকুটে লোকটার ঠিকানা টুকে নিল কিশোর। 'একজন প্রফেসর ক্রিমিনাল হতে পারেন না। তবু আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'আমিও যেতে চাই তোমাদের সঙ্গে,' হেসে বললেন মিসেস লোপেজ। 'নেবে?'

'হোয়াই নট?' পাল্টা প্রশ্ন করল রবিন।

ডক্টর জিঙের বাড়ি শহর থেকে খানিকটা দূরে। প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনে বিরাট লন।

পোর্চের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর। নেমে সদর দরজায় চলে এল ওরা।

একবারের বেশি ডোরবেল বাজানোর দরকার হলো না। দরজা খুললেন সাদা চুলো সুশ্রী এক বৃদ্ধ। হেসে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'ডক্টর জিঙ?' নিজেদের পরিচয় দেয়ার পর জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'কিশোর আমার বোনের ছেলে,' এগিয়ে এসে বললেন ম্যাডোনা লোপেজ। 'গোয়েন্দাগিরি করতে পছন্দ করে। ওরা তিন বন্ধু মিলে একটা রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছে। রহস্যটা এক চীনাকে নিয়ে। আপনি হয়তো সাহায্য করতে পারবেন ওদের।'

অতিথিদের নিজের স্টাডিতে নিয়ে গেলেন মিস্টার জিঙ। জানালেন ওদের সাহায্য করতে পারলে তিনি খুশি হবেন। ছোটকালে তিনিও নাকি কয়েকটা রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করে সফল হয়েছেন।

এসময় স্টাডিতে ঢুকলেন মিসেস জিঙ। তাঁর সঙ্গেও পরিচিত হলো কিশোররা।

যে জিঙের স্টাডিতে বসে কথা বলছে কিশোর, তিনি যে ক্রিমিনাল জিঙ নন, সে ব্যাপারে কিশোর এখন পুরোপুরি নিশ্চিত। এমন অমায়িক, নিষ্কলুষ চেহারার একজন মানুষ যে ক্রিমিনাল হতে পারেন না–কিশোরের মত বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'ইয়াঙ জিঙ নামের আর কাউকে চেনেন আপনি, প্রফেসর?' এক সময় জানতে চাইল কিশোর।

হেসে মাথা দোলালেন মিস্টার জিঙ, 'না, সরি।'

সম্প্রতি তাঁরা এশিয়া গিয়েছিলেন কিনা জানতে চাইল মুসা।

'না,' বললেন মিসেস জিঙ। 'বহুদিন ধরেই যাওয়া হয় না।'

'আসলে,' বললেন প্রফেসর। 'আমার আত্মীয় বলতে আমার দূরসম্পর্কের এক খালা আর চাচা। দু'জনই নিউ ইয়র্কে থাকেন। চীনে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখানে আমরা দু'জনই ভার্সিটিতে পড়াই। নিউ ইয়র্কের বাইরে তেমন একটা যাওয়াই পড়ে না আমাদের।'

হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল কিশোরের মাথায়। অনুমতি নিয়ে মিসেস

ফিয়োনাকে ফোন করল। নিচু কণ্ঠে মিস্টার জিঙের দৈহিক বর্ণনা দিল। শুনে মিসেস জিঙ জানালেন ক্রিমিনাল জিঙ মাঝবয়সী। ডান গালে বিরাট বড় একটা কাটা দাগ আছে। মাথার চুল কুচকুচে কালো।

'দুঃখিত,' কিশোর রিসিভার নামিয়ে রাখলে বললেন মিস্টার জিঙ। 'উঠতে হবে আমাকে। জরুরী একটা ক্লাস আছে।'

প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে কিশোররাও উঠে পড়ল। 'স্যার,' বলল কিশোর। 'অন্য কোন জিঙের কথা যদি জানতে পারেন, কাইন্ডলি আমাদের জানাবেন।'

সীগাল মোটেলের একটা কার্ড দিল তাঁকে কিশোর।

বিদায় নেয়ার আগে রবিন জানাল ওরা নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পেয়েছে। 'আপনি যাচ্ছেন তো অনুষ্ঠানে?'

'শুধু আমিই নই,' হেসে বললেন প্রফেসর। 'আমার গিন্নিও যাবেন। কনগ্র্যাচুলেশনস। আমরা অবশ্যই যাব। দেখব তোমরা কেমন রায় দাও।'

পাঁচ

ঈগল স্টার মোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করল কিশোর। টুকটাক কিছু কেনাকাটা করতে শপিং মলে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। ফেরার পথে স্টেলার সঙ্গে দেখা করার কথা তুলল রবিন। কিশোর ভাবল ভাল কথা মনে করেছে রবিন। তাই এখানে আসা।

লবিতে পা রাখতেই পাশের রুম থেকে চেঁচামেচি কানে এল তিন গোয়েন্দার। কান্নার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

'শিট!' চেঁচিয়ে বলল একটা মেয়েলী কণ্ঠ।

'প্রতিযোগিতা মনে হয় বন্ধই করে দেবেন.মিসেস ফিয়োনা,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। 'আমাদের কিছু একটা করা উচিত।'

'আরে দূর!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'আমি আর ে ই ওসবের মধ্যে!'

কিছু বুঝতে না পেরে মাথা গরম হয়ে উঠল কিশোরের। রুমে ঢুকবে কি ঢুকবে না বুঝে উঠতে পারছে না। তবে ওরা যে স্টেলার বান্ধবী বুঝতে পারছে।

এমন সময় সেখানে উদয় হলেন মিসেস ফিয়োনা। জানালেন ব্যবসার কাজে ঈগল স্টারে এসেছিলেন তিনি। মেয়েগুলো কেন চেঁচামেচি করছে জানেন তিনি।

'কেন?' সাগ্রহে জানতে চাইল কিশোর।

'হাওয়া হয়ে গেছে স্টেলা গর্ডন,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা।

'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল মুসা।

মুখ শুকিয়ে গেল কিশোরের। 'এত সতর্কতার পরও...' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বলল সে।

'কখন? কোত্থেকে?' অস্থির কণ্ঠে জানতে চাইল রবিন।

মিসেস ম্যাডোনা জানালেন কিছুক্ষণ আগে ওর কোন চিঠি আছে কিনা

জানতে ডেস্কক্লার্কের কাছে আসে স্টেলা। একটা চিঠি ছিল। ওটা নিয়ে এলিভেটরে ওঠে।

'তারপর?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।

'এরপর আর কেউ দেখেনি তাকে,' বললেন ম্যাডোনা লোপেজ। 'মোটেলের প্রায় সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এমন কি পার্ক অ্যাটেনডেন্টকেও। কেউ স্টেলাকে মোটেল থেকে বেরোতে কিংবা গাড়িতে করে কোথাও যেতে দেখেনি।'

'খাইছে!' স্বগতোক্তি করল মুসা।

'রিয়া কি এব্যাপারে আরও কিছু জানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রিয়ার সঙ্গেই ডেস্কক্লার্কের কাছে গিয়েছিল স্টেলা,' ম্যাডোনা বললেন। 'ডেস্কে পৌঁছে কিছুক্ষণের কথা বলে কোথায় যেন চলে যায় রিয়া, এখনও ফিরে আসেনি।'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ঘণ্টাখানেক হবে হয়তো।'

হাঁটতে হাঁটতে সামনের খোলা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা ও মিসেস ম্যাডোনা। স্টেলার গায়েব হয়ে যাওয়ার খবরে মুষড়ে পড়েছে সবাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল কিশোর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবে স্টেলাকে।

'কিন্তু শুরুটা করবে কোত্থেকে?' কিশোরের মনের কথা বুঝতে পেরে প্রশ্ন করল মুসা।

কিশোর বলল, 'স্টেলা উধাও হওয়ার আগে যে চিঠিটা পেয়েছে ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওটার ব্যাপারে খোঁজ নেয়া দরকার।'

দলটা এগিয়ে চলল ডেস্কক্লার্কের কাছে। কিশোর লোকটার কাছে জানতে চাইল স্টেলার চিঠিটা কোত্থেকে এসেছে জানা আছে নাকি তার।

হতাশ ভঙ্গিতে ডানে বাঁয়ে মাথা দোলাল সে।

আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা।

'আচ্ছা!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। 'স্টেলা তো আগে থেকেই জানত সে কিডন্যাপ হতে পারে।'

'হ্যাঁ, তো?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।

মুসা বলল, 'আমরা যাতে স্টেলাকে খুঁজে পাই সেজন্যে ক্লু হিসেবে চিঠিটা মোটেলের কোথাও সে রেখে যেতে পারে না?'

'ভাল বলেছ,' খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'খুঁজে দেখা দরকার।'

কাজে লেগে পড়ল তিন গোয়েন্দা। মিসেস ম্যাডোনাও যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে।

লিফটের দরজা থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। প্রতিটি কোনা, ওয়েস্টবাস্কেট, ফুলের টব পরখ করতে করতে এগোল সামনে।

খুঁজতে খুঁজতে সামনের এনট্রেন্সের কাছে বড়সড় একটা ওরিয়েন্টাল ফ্লাওয়ার ভাসে সাদা একটা খাম পেয়ে গেল কিশোর।

দলটাকে কাছে ডাকল চাপা কণ্ঠে।

খামের গায়ে প্রেরকের ঠিকানা নেই। প্রাপকের জায়গায় লেখা:

স্টেলা গর্ডন
থার্ড ফ্লোর
ঈগল স্টার মোটেল
নিউপোর্ট বীচ

কাঁপা হাতে খাম থেকে চিঠিটা বের করল কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা ও রবিন। চিঠিটা এরকম:

স্টেলা,
যেকোন মুহূর্তে কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারো তুমি। বিস্তারিত জানতে হলে এক্ষুনি চলে এসো কারপার্কের TVZ-774 নম্বর গাড়ির কাছে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

–সুইঙ

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন কিশোর। একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওদের মাথায়। নিমন্ত্রণপত্র থেকে অতিরিক্ত একটা G, X আর W পেয়েছে ওরা পরে। যা দিয়ে অর্থবোধক কোন শব্দ তৈরি করা যায় না।

ফিরে এল ওরা। নিজেদের রুমে ঢুকেই নিমন্ত্রণপত্রগুলোর ওপর হামলে পড়ল।

'আর তিনটে বর্ণ দরকার আমাদের,' বলল কিশোর উত্তেজিত কণ্ঠে।

'জানি,' রবিনের কণ্ঠেও উত্তেজনা।

'আমিও জানি,' বলল মুসা একই কণ্ঠে। 'S, I, N. ঠিক?'

'কিন্তু,' মিসেস ম্যাডোনা বললেন। 'তোমাদের এই ধাঁধা সমাধানের আগে স্টেলার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা উচিত।'

জবাব দেয়ার সময় পেল না কিশোর। তার আগেই কাঙ্ক্ষিত বর্ণ তিনটে আবিষ্কার করে ফেলেছে ও।

SWING

'কে হতে পারে এই সুইঙ?' মুসার প্রশ্ন।

খানিকটা ভেবে নিয়ে কিশোর বলল, 'শুধু এটুকুই আন্দাজ করতে পারছি নামটা চায়নিজ।'

'কারেক্ট!' একযোগে বলল রবিন ও মুসা।

'এই সুইঙের সঙ্গে ইয়াঙ জিঙের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে,' সন্দেহ প্রকাশ পেল কিশোরের কণ্ঠে।

রবিন ধারণা করল এই 'সুইঙ' শব্দটা হয়তো কোন অর্থবোধক পূর্ণাঙ্গ শব্দের কোড।

'হতে পারে,' ওকে সমর্থন করল কিশোর।

অর্থ যা-ই হোক, অতিরিক্ত নিমন্ত্রণপত্রগুলো যে এই 'সুইঙ'ই পাঠিয়েছে সে ব্যাপারে ওরা মোটামুটি নিশ্চিত।

X বর্ণটা এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে। কিশোর ঠিক করল পরে মাথা ঘামাবে। আগে স্টেলাকে খুঁজে বের করা দরকার।

বিকেলে আবার ঈগল স্টারে এসে পৌছল ওরা। কার পার্ক অ্যাটেনডেন্ট কেরির সঙ্গে কথা বলল। লোকটা আজই যোগ দিয়েছে ঈগল স্টারে। টিভিজেড-সেভেনসেভেনফাইভ নম্বরের কোন গাড়ি নাকি সে পার্কিং লটে দেখতে পায়নি। সন্দেহজনক তেমন কাউকেই চোখে পড়েনি।

'তবে,' জানাল কেরি। 'একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একনজর দেখেছিলাম। দূর থেকে যেটুকু বুঝেছি মেয়েটি খুব সুশ্রী। তবে ভাল করে তাদের খেয়াল করিনি, করার প্রয়োজনও মনে করিনি।'

'ওদের গাড়ির নম্বর...'

'নাহ্!' কিশোরের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কেরি। 'খেয়াল করিনি।'

'আমার ধারণা আপনি স্টেলাকেই দেখেছেন,' রবিন বলল।

'হতে পারে!' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল কেরি।

নিজেদের মোটেলে ফিরে এল কিশোররা। দেখল মিসেস ফিয়োনা জনসন ড্রইং রুমে ওদের অপেক্ষায় বসে আছেন। চিন্তিত।

পকেট থেকে স্টেলার চিঠিটা বের করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিল কিশোর।

খামটা হাতে নিলেন তিনি। খুললেন কাঁপা হাতে। কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে পড়লেন।

'কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!' মুখ খুললেন ফিয়োনা। 'মাথা ঘুরছে আমার!'

'পুলিশে খবর দেয়া দরকার,' কিশোর বলল। 'এই চিঠির কথা আর কাউকে বলিনি। কিন্তু পুলিশকে বলা দরকার। গাড়ির নম্বর জানলে সুইঙকে পাকড়াও করা তাদের জন্যে কঠিন কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

মিসেস ফিয়োনা নিজেই ফোন করলেন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। এরপর ঈগল স্টারে ফোন করে জানলেন রিয়া ফিরে এসেছে। ওকে জানালেন যারা যারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে সে যেন এক্ষুনি মিসেস ম্যাডোনা লোপেজের সীগাল মোটেলে চলে আসে।

নিউপোর্ট বীচের বাইরে থেকে যে ক'জন মেয়ে এসেছে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তাদের প্রায় সবাই উঠেছে ঈগল স্টারে। আর ছেলেরা ও তিন-চারজন মেয়ে উঠেছে মিসেস ম্যাডোনার সীগাল মোটেলে।

সীগালের হলরুমে একে একে জড় হলো সব প্রতিযোগী। তিন গোয়েন্দাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ঢুকলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। ছাব্বিশ জন প্রতিযোগী উপস্থিত হয়েছে।

মিসেস ফিয়োনা হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মৃদু গুঞ্জন। পিনপতন নীরবতা নেমে এল হলরুমে।

'স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার কারণ বলতে পার কেউ তোমরা?' কোন ভূমিকা

ছাড়াই শুরু করলেন ফিয়োনা।

বলতে পারল না কেউ। এমন কি স্টেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিয়া মর্টনও না।

এবার কিশোর নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল ওরা কেউ সুইঙ নামের কাউকে চেনে কিনা।

'চিনি,' বলল একটা বেঁটে ছেলে। 'সুইঙ বিখ্যাত এক হকি খেলোয়াড়ের ডাক নাম। তার পুরো নাম স্যাম সুইঙ সান।'

'চায়নিজ?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ। তবে জন্ম এই নিউ ইয়র্কে। সুইঙের খেলা দেখেছি আমি। অসাধারণ!'

'এখন সে কোথায় আছে বলতে পার?' কিশোর প্রশ্ন করল।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ছেলেটি বলল, 'আমার জানামতে সে এখন দলের সঙ্গে কানাডা আছে। প্র্যাকটিস করছে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে।'

হতাশ হলো তিন গোয়েন্দা। এই হকি খেলোয়াড় ওদের টার্গেট নয়।

মিসেস ফিয়োনা জানিয়ে দিলেন আজ আর রিহার্সাল হবে না। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যেতে না যেতে হলরুমে ঢুকলেন পুলিশের দু'জন অফিসার।

মিসেস ফিয়োনা তাঁদের জানালেন স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা যেন বাইরে জানাজানি না হয়। সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে তার প্রভাব পড়বে।

পরদিন বিকেল।

ব্যবসায়িক জরুরী কাজ সেরে ঈগল স্টার থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ম্যাডোনা। সঙ্গে আছে তিন গোয়েন্দা।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পার্কিং লটে এসে দাঁড়ালেন তিনি। সামনে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

কোথায় তাঁর গাড়ি? যেখানে রেখে গিয়েছিলেন নেই সেখানে। চট্ করে তীক্ষ্ণ চোখে গোটা পার্কিং লটে নজর বোলাল কিশোর। নেই গাড়িটা। গায়েব হয়ে গেছে।

'আমাদের গাড়ি সরিয়ে রেখেছেন নাকি?' কেরিকে বলল কিশোর।

'কই, না তো!' অবাক হলো সে। 'যেখানে ছিল নেই সেখানে?'

'নাহ্!'

খুব বিষণ্ন দেখাল কেরিকে। এর আগেও কিশোরের সঙ্গে একবার কথা হয়েছে তার, স্টেলা নিখোঁজ হওয়ার পর। কোন সাহায্য করতে পারেনি সেবার। এবারও পারছে না। আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে।

'আপনার গাড়ি খোয়া গেছে, আন্টি!' বলল কিশোর প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে।

ছয়

'চোরের স্বর্গে এসে পড়েছি দেখছি আমরা!' বলল রবিন। রেগে গেছে।

'ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'চোরের মুল্লুক!'

রবিন আর মুসার কাঁধে হাত রাখলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'পুলিশ ঠিকই গাড়িচোরকে ধরে ফেলবে, দেখো।'

'যত্তসব উটকো ঝামেলা!' মেজাজ খিঁচড়ে গেছে কিশোরেরও।

'আমরা মানুষ বলেই আমাদের উটকো ঝামেলা পোহাতে হয়,' হাসলেন ম্যাডোনা লোপেজ।

একটা ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করল ওরা। যাবে শহরের উত্তর প্রান্তে। মিসেস ম্যাডোনা ওখানে একটা প্লট কিনবেন। কেনার আগে তিন গোয়েন্দাকে জায়গাটা দেখিয়ে আনার ইচ্ছে তাঁর।

কিশোর বসল সামনে, ড্রাইভারের পাশে। মুসা, রবিন আর মিসেস ম্যাডোনা পেছনে।

ড্রাইভার তরুণটি বাচাল স্বভাবের। বক্‌বক্ করে চলল সে সারা রাস্তা।

'নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামনে, জানো তোমরা?' বলল সে। জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে বলে চলল, 'খুব আকর্ষণীয় হয় অনুষ্ঠানটা। সারা আমেরিকা থেকে ছেলেমেয়েরা আসে অংশ নিতে। কিন্তু এবার মনে হয় জমবে না।'

'কেন কেন?' উৎসাহী কণ্ঠে প্রশ্ন করল কিশোর।

'শুনলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের এক প্রতিযোগী নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে!' বলল সে।

তার মুখে কথাটা শুনে ভীষণ অবাক হলো তিন গোয়েন্দা।

'কার কাছে শুনেছেন?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'শহরের অনেকেই জানে ব্যাপারটা,' জানাল ড্রাইভার। 'সবাই বলাবলি করছে। এর মধ্যে হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েটার।' দাঁত বের করে হাসল সে।

'বলেছে আপনাকে!' ক্ষেপে উঠল কিশোর। 'না জেনে একটা মেয়ে সম্পর্কে বাজে কথা বলা ঠিক নয়।'

'সরি!'

'ইটস্ ওকে,' মুসা বলল। 'আর কি কি শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি মেয়েটা নাকি কিডন্যাপ হয়েছে,' বলল ম্যাক্স পাওয়ার। লাইসেন্স নম্বরসহ ড্রাইভারের ছবি ঝোলানো আছে ক্যাবের সামনের দিকে। ওতেই নামটা দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা।

এর মধ্যে মাইল চারেক পেরিয়ে এসেছে ওরা। হঠাৎ সামনে একটা গাড়ি দেখতে পেল কিশোর। ওদেরটার তুলনায় একটু ধীরে চলেছে বলে মনে হলো। গাড়িটার কাছাকাছি আসতে পেছনের সীট থেকে মাথা উঁচু করে সামনে তাকাল রবিন ও মুসা।

খপ্ করে রবিনের হাত আঁকড়ে ধরল মুসা, 'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল। 'আমাদের গাড়ি না?'

তীক্ষ্ণ চোখে সামনে তাকিয়ে ম্যাডোনা বললেন, 'নম্বর তো মিলছে না।'

'নম্বর প্লেট হয়তো পাল্টে ফেলেছে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'ওটা আমারই গাড়ি,' হঠাৎ বলে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ।

'ফেন্ডারের বাঁ পাশে পলিশ উঠে যাওয়ার একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ তোমরা? বেশ পুরোনো দাগ ওটা। গাড়িটা আমারই!'

এর মধ্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে ম্যাক্স। 'আপনি শিয়োর ওটা আপনারই?' বলল মিসেস ম্যাডোনার উদ্দেশে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'ওটা আমাদের গাড়ি।'

'ধাওয়া করব?'

'করুন!' একসঙ্গে বলে উঠল তিন কিশোর।

মুহূর্তে গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটার পাশাপাশি চলে এল ট্যাক্সিক্যাব। চোর ব্যাটা সংঘর্ষ এড়াতে রাস্তার একেবারে কিনারে চলে গেল। বুঝে গেছে বিপদে পড়েছে। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে ম্যাডোনার গাড়ি। ট্যাক্সিক্যাবকে পেছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেছে এর মধ্যে।

হাল ছেড়ে দেয়ার বান্দা নয় ম্যাক্স। দেখতে দেখতে দু'গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব আবার কমিয়ে ফেলল সে।

পাশাপাশি এগোতে লাগল আবার।

মুগ্ধ চোখে কিশোর তাকাল ম্যাক্সের দিকে। পাকা ড্রাইভার সে। সংঘর্ষ এড়িয়ে এমনভাবে গাড়ি ছোটাচ্ছে ম্যাক্স, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে গাড়িচোর।

ম্যাক্স খেয়াল করল রাস্তা দ্রুত চেপে আসছে। পাশাপাশি চালালে বিপদ ঘটে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

সামনে একটা গর্ত দেখতে পেয়ে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষল সে।

মিসেস ম্যাডোনার গাড়ি এগিয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল।

গর্তটা পেরিয়ে আবার গতি বাড়িয়ে দিল ম্যাক্স। সামনে ঝুঁকে আছে। একটু একটু করে দূরত্ব কমে আসতে লাগল আবার।

'কাজটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না!' ভীত কণ্ঠে বলে উঠলেন ম্যাডোনা। ওই ব্যাটা চোর কখন কি করে বসে বলা যায় না। বিপদ হতে পারে আমাদের।'

'ভয় পাবেন না ম্যাডাম,' বলল ম্যাক্স। 'একসময় রেসিং ড্রাইভার ছিলাম আমি। বিপদ এড়িয়ে কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় জানি। তাছাড়া ওই ব্যাটার দৌড় কতদূর জানা হয়ে গেছে আমার। ওকে ধরা শুধু সময়ের ব্যাপার। আপনারা নিশ্চিন্তে বসে থাকুন।'

সাত

আবার ওটার পাশাপাশি চলে এসেছে ট্যাক্সিক্যাব। ম্যাক্সের উদ্দেশ্য রাস্তার পাশের এবড়োখেবড়ো পথে ওটাকে নামিয়ে দেয়া। তাহলে বিশ গজও এগোতে পারবে না গাড়িচোর। গাড়ি থামাতে বাধ্য হবে সে।

'ম্যাক্স!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'কি করছ তুমি? মারা পড়ব তো সবাই!'

'চোরকে ছেড়ে দিতে বলছেন?' ওটার আরও কাছে ঘেঁষে বলল ম্যাক্স।

ভয় পায়নি তিন গোয়েন্দা। বরং উপভোগ করছে ব্যাপারটা। বহুবার ওরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। কখনও ধাওয়া করেছে, কখনও খেয়েছে।

'এভাবে পাশাপাশি না এগিয়ে ওটার পেছন পেছন ছুটলেই তো হয়,' আন্টির কথা চিন্তা করে বলল কিশোর। তাঁর হার্টের অসুখ আছে, কখন কি ঘটে যায় বলা যায় না।

কিন্তু কিশোরের কথা শোনার সময় নেই ম্যাক্সের। দুটো গাড়ি একই সমান্তরালে ছুটছে। ডানে রয়েছে ট্যাক্সিক্যাব। চোরের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে সংঘর্ষ ঘটে ঘটুক, রাস্তা থেকে নামতে রাজি নয় সে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স। গলা চড়িয়ে হাল ছেড়ে দিতে বলল অন্য গাড়ির ড্রাইভারকে।

'লাভ হবে না,' বলল কিশোর। 'সবগুলো জানালার কাঁচ তোলা, আপনার কথা শুনতে পাবে না।'

হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। ম্যাক্স ছাড়া বাকি সবাই গলা উঁচিয়ে পেছনে তাকাল। দেখা গেল ছাদে জ্বলন্ত লাইটওয়ালা একটা কার দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'পুলিশ!'

অস্ফুটে কি যেন বলল ম্যাক্স। গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল।

ওদিকে সামনের গাড়িটা আচমকা থেমে গেছে। দরজা খুলে গেল। লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়িচোর।

রাস্তা থেকে একটা সরু ড্রাইভওয়ে চলে গেছে বাঁয়ের একটা ফার্মহাউজের দিকে। সেদিকে ছুটল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

মিসেস ম্যাডোনার গাড়ির পেছনে এসে থেমে দাঁড়াল ট্যাক্সিক্যাব।

কয়েক মিনিট পর পুলিশের গাড়ি এসে থেমে দাঁড়াল ক্যাবের পেছনে।

দু'জন অফিসার নেমে এগিয়ে এল।

'ব্যাপার কি?' ম্যাক্সের উদ্দেশে বলল প্রথম অফিসার।

'জানো কত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে তুমি?'

ম্যাক্সকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে বলল অন্য অফিসার, 'ওই গাড়িটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলে কেন?'

'আমি একটা চোরকে ধরার চেষ্টা করছিলাম, স্যার,' বলল ম্যাক্স। গাড়ি থেকে নেমে এল তিন গোয়েন্দা ও মিসেস ম্যাডোনা।

কিশোর পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলল দুই অফিসারকে।

'গাড়ি তো খালি দেখছি,' বলল প্রথম অফিসার। 'চোরটা গেল কোথায়?'

সামনের ড্রাইভওয়ে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'ওই পথে পালিয়েছে। আমরা তাকে ভাল করে দেখতেও পাইনি।'

ওদের কথা বিশ্বাস করার আগে তিন গোয়েন্দাকে নানান ধরনের প্রশ্ন করল দুই অফিসার।

ওরা কোথায় থাকে, এখানে কি করছে–ইত্যাদি ইত্যাদি। অকপটে তাদের

সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল তিন কিশোর।

'ইনি মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ,' বলল কিশোর। 'আমার খালা।'

'ম্যাডোনা লোপেজ?' ভুরু কুঁচকে উঠল প্রথম অফিসারের। বুকের ব্যাজ বলে দিচ্ছে তার নাম ফ্রাঙ্ক হেনরি। একটা নোটবুক বের করল সে প্যান্টের পকেট থেকে। পাতা উল্টিয়ে খুঁজে বের করল কি একটা তথ্য।

'আপনিই কি আমাদেরকে আপনার গাড়ি চুরির রিপোর্ট করেছিলেন?' প্রশ্ন করল সে। 'লাইসেন্স নম্বরটা আরেকবার বলুন।'

কিশোর ওর ওয়েস্ট ব্যাগ থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা বের করে বাড়িয়ে দিল ফ্রাঙ্কের দিকে। 'ওই গাড়িটায় যে নম্বর প্লেট ঝুলছে ওটা ভুয়া।'

'আমার গাড়ি নিয়ে যেতে পারি?' জানতে চাইলেন মিসেস ম্যাডোনা।

'পারেন,' হেসে বলল সোয়ানসন টমাস নামের অপর অফিসারটি। 'তবে আসল নম্বর প্লেট লাগিয়ে নিয়ে তবে।'

'আসলটা গাড়ির মধ্যে থাকতে পারে,' আন্দাজ করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' বলল ফ্রাঙ্ক। 'এসো, খুঁজে দেখি।'

সামনে এগোল দলটা। কুশন তুলে দেখা হলো। কার্পেট সরিয়ে দেখা হলো।

কারের ট্রাঙ্ক খুলল সোয়ানসন। স্পেয়ার টায়ার, ন্যাকড়া, পিকনিক হ্যাম্পারে ওটা ঠাসা। 'পেয়েছি!' হঠাৎ বলে উঠল সোয়ানসন। পিকনিক হ্যাম্পারের নিচ থেকে একটা প্লেট বের করে আনল।

নকলটা নামিয়ে ওটা লাগিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। তারপর জানাল ওরা ইচ্ছে করলে এখন যেতে পারে। আরও বলল, 'আমরা সবখানে জানিয়ে দিচ্ছি মিসেস ম্যাডোনা লোপেজের গাড়ি পাওয়া গেছে।' মিসেস ম্যাডোনার দিকে ফিরল সে। 'তারপরও পথে যদি কোন অসুবিধে হয় আমাদের কথা বলবেন। ছেড়ে দেবে।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল সে।

ম্যাক্সের দিকে ফিরল ফ্রাঙ্ক। 'ভাল কাজ করেছ বলে তোমার জরিমানা করলাম না, হে!' হাসল। 'কিন্তু সাবধান! অকারণে যদি এমন করো খবর আছে!'

কিছু না বলে হাসল ম্যাক্স।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফার্মহাউসটার দিকে ছুটল দুই পুলিশ অফিসার।

কিশোর চেক করে দেখল গাড়িতে যে ফুয়েল আছে তাতে অনায়াসে ফিরে যাওয়া যাবে। অবশ্য আন্টি যদি ফিরে যেতে চান। তাঁর প্ল্যান ছিল শহরের উত্তর প্রান্তে যাওয়া।

'আজ আর যাব না ওদিকে,' কিশোরের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন মিসেস ম্যাডোনা। 'টায়ার্ড লাগছে।'

ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন তিনি। ম্যাক্সকে বললেন, 'থ্যাঙ্কস্ আ লট।'

জবাবে মিষ্টি হেসে ক্যাব ছেড়ে দিল ম্যাক্স।

নিউপোর্ট বীচের দিকে ফিরে চলল কিশোররা।

সীগালের লবিতে রিয়া মর্টনের সঙ্গে দেখা হলো তিন গোয়েন্দার। রিয়া

জানাল স্টেলার মা বাবা এসেছেন নিউপোর্টে। উঠেছেন ঈগল স্টারে।

'মেয়ের শোকে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন তাঁরা,' বলল রিয়া। 'আমি জানিয়েছি তোমাদের কথা। তোমরা যে স্টেলাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছ সেটা জানিয়ে তাঁদের কিছুটা আশ্বস্ত করেছি।'

'গুড!' হাসল কিশোর। 'ভাল কাজ করেছ।'

পরদিন।

ঈগল স্টারে স্টেলার মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

শুরুতেই গর্ডন দম্পতিকে সমবেদনা জানাল কিশোররা। স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে যতটুকু জানে, জানাল। সুইঙের চিরকুটটার কথাও বলল।

ওদের গাড়ি চুরি যাওয়া ও উদ্ধারের কাহিনী শুনিয়ে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় গাড়িচোরের সঙ্গে সুইঙের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

এমন সময় ওখানে হাজির হলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। পরিচিত হলেন মিস্টার ও মিসেস গর্ডনের সঙ্গে। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি।

প্রতিযোগিতার আগেই স্টেলাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে তিনি তাঁর আশার কথা জানালেন। এ-ও জানালেন কিশোরদের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা আছে।

'এতবড় একটা আয়োজন বন্ধ করে দেয়া যায় না,' শেষে যোগ করলেন মিসেস ফিয়োনা। 'সোসাইটির বদনাম হয়ে যাবে তাহলে। আমি জানি কিশোররা ঠিকই স্টেলাকে খুঁজে বের করবে। তাই আমি আমার কাজ ঠিকমত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। কাল থেকে আবার পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হবে,' রিয়ার দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। 'ঈগল স্টারের সবাইকে জানিয়ে দিতে যাচ্ছি আমি।'

বিদায় নিলেন তিনি। তিন গোয়েন্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের রুমের দিকে চলে গেলেন গর্ডন দম্পতি।

'কাল সকালে রিহার্সাল হবে সোসাইটির হলরুমে,' বলল রিয়া। 'মিসেস ফিয়োনা সকালে ফোন করে আমাকে জানিয়েছেন। কিন্তু দেখ, শুধু ফোন করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সশরীরে চলে এসেছেন।'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি খুবই সিরিয়াস।'

'তোমরা যাবে রিহার্সালে?' শুধাল রিয়া। 'সবাইকে পাবে একসঙ্গে। তদন্তের সুবিধে হতে পারে।'

'যাব,' কিশোরের সংক্ষিপ্ত জবাব।

সোমবার সকালে সোসাইটির হলরুমে ঢুকে কিশোররা দেখল রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে।

ক্যাট-ওয়াক, নাচ, গান, কথা বলা—সব ধরনের অনুশীলন চলছে।

কালো চুল আর নীল চোখের একটা ছেলের প্রতি কিশোরের দৃষ্টি বিশেষভাবে আটকে গেছে। চ্যাপ্টা চেহারা। তবে দারুণ মিষ্টি তার হাসি। চীন, কোরিয়া বা জাপান, যে কোন দেশের হতে পারে সে—ধারণা করল গোয়েন্দা-প্রধান। ছেলেটি

দারুণ নাচতে পারে। গানের গলাও চমৎকার। সবকিছু বাদ দিলে শুধু ওই অসাধারণ হাসি দিয়েই ছেলেটি জিতে নিতে পারে 'জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার'-এর সম্মান। অবশ্য স্টেলা যদি অংশ নিতে না পারে।

'কিশোর,' হঠাৎ বলল রবিন। 'আমার মনে হয় স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার কোন সম্পর্ক আছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল মুসা।

'থাকতে পারে,' কিশোর বলল। 'স্টেলার অনুপস্থিতিতে ওই ছেলেটি সেরা,' নীল চোখের ছেলেটিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কি দারুণ তার হাসি!'

'হ্যাঁ,' একযোগে একমত হলো রবিন ও মুসা।

রিহার্সাল শেষে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। পরিচিত হলো তার সঙ্গে। জানতে পারল ছেলেটি কোরিয়ান। নাম কিম ইম চাক।

'রিহার্সাল দেখে তো মনে হলো তুমি ফাইনালে সবাইকে চমকে দেবে,' হেসে বলল কিশোর।

'আরে না!' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কোরিয়ান ছেলেটি। 'আমার চেয়ে কত ভাল ভাল প্রতিযোগী আছে।'

এক পর্যায়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সুইঙ নামের কাউকে চেন তুমি?'

'নাম শুনে মনে হচ্ছে সে চায়নিজ,' জবাব দিল কিম। 'কিন্তু আমি প্রফেসর ইয়াঙ জিঙ ছাড়া আর কোন চায়নিজকে চিনি না।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুসা দেখল টেবিলে কাজে মগ্ন কিশোর। রহস্যময় নিমন্ত্রণপত্রগুলো ছড়িয়ে আছে ওর সামনে।

'গুডমর্নিং, কিশোর,' পেছন থেকে বলল সে। 'আজ বেশি সকালে উঠে পড়েছ মনে হচ্ছে।'

'আরও ক'টা বর্ণ পেয়ে গেছি,' হাসিমুখে জানাল গোয়েন্দা-প্রধান। 'এবং কেন এগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সেটাও বুঝতে পেরেছি।'

'দারুণ!'

এর মধ্যে রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে মুসার পাশে।

'কি কি?' জানতে চাইল মুসা।

বর্ণগুলো কাগজে লিখে রেখেছে কিশোর। দেখল দুই সহকারী।

P H O E। এবং দুটো করে N এবং I ।

'নতুন আবিষ্কৃত শব্দগুলো অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা,' বলল কিশোর। 'আমাদের হাতের ছোঁয়ায় গরম হয়ে একটা একটা করে বর্ণ ফুটে উঠেছে।'

'ওয়াও!' অবাক হলো রবিন। 'আজ যে বর্ণগুলো পেয়েছ সেগুলো দিয়ে কোন শব্দ উদ্ধার করা গেছে?'

'হয়তো,' রহস্য করল কিশোর।

'মানে?' একযোগে প্রশ্ন করল দুই সহকারী।

'PHOENIX,' বলল কিশোর। 'এবং SWING।'

'অর্থ?' কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল মুসার।

আট

কাগজে একটা বাক্য লিখল কিশোর। অবাক হয়ে ওটার দিকে চেয়ে রইল মুসা ও রবিন।

PHOENIX STOLEN CROWN SWING

রবিন বলল, 'যতদূর জানি ফিনিক্স হলো পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ এক পাখি। বিশাল দুটো ডানা আছে ফিনিক্সের। সেই ফিনিক্সের ডানার নিচেই কি তাহলে মুকুটটা লুকিয়ে আছে?'

হাসল কিশোর। 'হয়তো। কে জানে সেই ফিনিক্সই মিসেস ফিয়োনার মুকুটটা নিয়ে কোন অজানা মায়া নগরীতে পাড়ি দিয়েছে কিনা।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল প্রধান। 'আমার মনে হয় বাক্যটা অসমাপ্ত। আরও একটা শব্দ–একটা ভার্ব মিস করছি মনে হয় আমরা।'

'হ্যাঁ,' মুসা জবাব দিল। 'হয়তো একটা অক্সিলিয়্যারি ভার্ব।'

'কার্ডগুলো সরিয়ে রেখে অনুমানে একটা শব্দ পছন্দ করতে হবে আমাদের,' বলল রবিন।

'তাই করতে হবে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কারণ কার্ডে আর কোন বর্ণ নেই। আমরা যে শব্দটা মিস করছি ওটা হয়তো ওই খোয়া যাওয়া কার্ডে ছিল।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ। যোগ দিলেন তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

তিনি বললেন, 'অক্সিলিয়্যারি ভার্ব মূলত পাঁচটা। অ্যাম, ইজ, আর, হ্যাভ এবং হ্যাজ। পাস্ট ফর্মে ওয়াজ, ওয়্যার এবং হ্যাড।'

এগুলো দিয়ে বিভিন্নভাবে তৈরি করার পর দেখা গেল মোটামুটি অর্থবোধক শব্দ দাঁড়াচ্ছে চারটে:

PHOENIX IS STOLEN CROWN SWING
PHOENIX WAS STOLEN CROWN SWING
PHOENIX HAS STOLEN CROWN SWING
PHOENIX HAD STOLEN CROWN SWING

তৃতীয় বাক্যটাই পছন্দ করল তিন গোয়েন্দা:

PHOENIX HAS STOLEN CROWN SWING

এখনও রয়ে গেছে সমস্যা। দুটো অর্থ হতে পারে বাক্যটার, 'চোরাই মুকুটটি ফিনিক্সের কাছে আছে–সুইঙ' অথবা 'মুকুটটি চুরি করেছে ফিনিক্স–সুইঙ'।

প্রথম বাক্যটাই মনে ধরল কিশোরের। মুকুট চুরির পেছনে হাত আছে ফিনিক্স নামের কোন এক ক্রিমিনালের, বুঝতে অসুবিধে হলো না তিন গোয়েন্দার।

দরজায় নক হলো হঠাৎ। উঠে গিয়ে খুলল মুসা। হাতে কেইবলগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পোর্টার দেখল সে।

'ম্যাডাম আছেন?' জানতে চাইল সে।

'হ্যা।'

'কেইবলগ্রামটা তাঁর,' বলে ওটা মুসাকে দিল সে।

কেইবলগ্রামটা পড়ে ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'লুকিয়ে লুকিয়ে আমিও গোয়েন্দাগিরি করছিলাম তোমাদের পাশাপাশি,' বললেন তিনি। 'আমার পুরোনো এক বন্ধু টেড উইলিয়ামের কেইবলগ্রাম এটা।'

'এর মধ্যে তো গোয়েন্দাগিরির কিছু দেখছি না, আন্টি!' অবাক হলো কিশোর।

'টেড কে, জানো?' হাসলেন মিসেস ম্যাডোনা। 'স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন চৌকস এজেন্ট। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তার কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম সম্ভব হলে যেন শীঘ্রি নিউপোর্ট বীচে চলে আছে। সে লিখেছে একদিন আগেও ভীষণ ব্যস্ত ছিল। হাড়ভাঙা খাটুনির পর হাতের মিশনটা শেষ করেছে কাল। এখন নিউপোর্ট বীচে আসতে টেডের আর কোন সমস্যা নেই।'

'কোথেকে কেইবলগ্রাম পাঠিয়েছেন উনি?' জানতে চাইল রবিন।

'তা তো জানি না,' বললেন ম্যাডোনা। 'জানায়নি। জানানোর নিয়ম নেই। টেড একজন সিক্রেট এজেন্ট।'

'বুঝলাম,' বলল কিশোর। 'কিন্তু এখানে ডেকেছেন কেন তাঁকে?'

'তোমাদের সাহায্য করতে।'

'তার কি কোন দরকার ছিল?' বলল রবিন।

'অসুবিধে কি?' মিসেস ম্যাডোনা জবাব দেয়ার আগেই বলল কিশোর। 'বরং ভালই হবে উনি এলে।'

সকালের নাস্তা সেরে পুলিশ অফিসার ফ্রাঙ্কের কাছে ফোন করল কিশোর। স্টেট ট্রুপার হেডকোয়ার্টারেই পাওয়া গেল তাকে। গাড়িচোরের কোন হদিস পাওয়া গেল কিনা জানতে চাইল কিশোর।

'না,' জবাব দিল অফিসার। 'তবে শিগ্‌গির পেয়ে যাব আশা করছি। আর পেলেই তোমাদের খবর জানাব।'

'থ্যাঙ্কস্,' রিসিভার রেখে দিল ও।

সকাল দশটার দিকে মিসেস ফিয়োনার বাসায় এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। ওদের দাঁড় করানো বাক্যটার কথা বলল কিশোর। তারপর যোগ করল, 'দুটো ব্যাপারে আমি শিওর। সুইঙ কোন মানুষের নাম আর চোরাই মুকুট বলতে আপনার মুকুটটাকেই বোঝানো হচ্ছে।'

'ওটা আমার কাছ থেকে খোয়া গেছে বলে?'

'জ্বি।' বলল কিশোর। 'ম্যাম, আপনার নকল মুকুটটা আমরা আরেকবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চই!'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভেতরের রূমে চলে এলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। জিনিসটা কেবিনেট থেকে বের করে সামনের একটা টেবিলে রাখলেন।

কিশোর আর মুসা একযোগে হাত বোলাল ওটার গায়ে। বলা যায় না,

আচমকা কোন ক্লু পেয়েও যেতে পারে।

মুকুটটা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল ওরা, কিশোর আর মুসা টেরই পেল না ওদের হাতের কি দশা হয়েছে। যখন পেল তখন ওরা রীতিমত ধাঁধাগ্রস্ত। সবক'টা আঙুল সবুজ হয়ে গেছে। জ্বালাপোড়া করছে ভীষণ।

'মাই গড!' আঁতকে উঠলেন ফিয়োনা জনসন। 'বিষ!'

'বিষ!' মুখ শুকিয়ে উঠল কিশোরের।

'হ্যাঁ! জলদি হাত ধুয়ে এসো। জলদি!'

কাজ হলো না। পানি আর সাবানে পুরোপুরি দূর হলো না বিষ।

'দাঁড়াও,' ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা। 'আমার ডাক্তারকে ফোন করে দেখি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোন করে ফিরে এলেন তিনি।

'পেট্রল দিয়ে হাত ভিজিয়ে, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নিতে বলেছে ডাক্তার,' ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন ফিয়োনা। 'রবিন, আমার গ্যারেজে পেট্রলের ক্যান আছে, জলদি ওটা নিয়ে এসো! জলদি করো!'

ছুটল রবিন। ছট্‌ফট্ করছে কিশোর আর মুসা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় হাত থেকে মুছে গেল সবুজ বিষের শেষ চিহ্ন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুই গোয়েন্দা।

'ভাগ্যিস জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ারের মাথায় পরানোর আগে এটা হাতে পড়েছিল আমাদের,' বলল কিশোর দুর্বল কণ্ঠে।

'তবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন মিসেস ফিয়োনা। 'আমার মনে হয় জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার চোরের টার্গেট ছিল না। নিশ্চই সে বুঝে গেছে তোমরা তার পেছনে লেগেছ। তাই তাকে ধরার আগেই সে তোমাদের মারতে চেয়েছিল।'

'ঠিক বলেছেন,' কিশোর বলল। এখন অনেক ভাল বোধ করছে। মুসাও।

'ম্যাম, আপনার পরিচিত কোন কেমিস্ট আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে, কেন বলো তো?'

'বিষটার নাম জানতে পারলে ভাল হত।'

'গুড আইডিয়া!' বলল রবিন।

মুকুটের গায়ে কাগজ ঘষে ওটা একটা খামে ভরলেন মিসেস ফিয়োনা। উঠলেন। সবাই বেরিয়ে এল।

ফিয়োনা তাঁর গাড়িতে উঠে পড়লেন। চললেন কেমিস্টের বাসায়।

কিশোররা ওদের গাড়িতে উঠল।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল মুসা।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'প্রফেসর জিঙের বাসায়। ফিনিক্সের ব্যাপারটা তিনি ভাল বলতে পারবেন মনে হয়।'

রবিন বলল, 'পৌরাণিক কাহিনী পড়ে জেনেছি ফিনিক্স পাখি জীবদ্দশায় নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে পৌঁছে আগুনে আত্মাহুতি দেয়। এবং সেই আগুন থেকেই আবার উঠে আসে আরেক সত্তা নিয়ে। ওরা পুনর্জন্ম লাভ করে পাঁচ থেকে ছয়শো

বছর পর পর।'

'অনেক জানো দেখছি,' হাসল কিশোর। 'প্রফেসর জিঙ হয়তো আরও কোন তথ্য দিতে পারবেন।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীর পাখিকে ইঙ্গিত করেনি সুইঙ,' সন্দেহ প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে। 'তার চেয়ে বরং ধরে নেয়া যায় অ্যারিজোনার ফিনিক্স নগরীর কথা বলতে চাইছে সে। হয়তো বোঝাতে চাইছে ওখানেই আছে ফিয়োনা জনসনের মুকুট।'

নয়

তিন গোয়েন্দাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন প্রফেসর দম্পতি। পরনের পোশাক দেখে কিশোর বুঝতে পারল কোথাও বেরোচ্ছেন মিস্টার আর মিসেস জিঙ। লজ্জা পেয়ে গেল ও।

'ভুল সময়ে এসে পড়েছি মনে হয় আমরা,' বলল গোয়েন্দা-প্রধান।

'আপনাকে জানিয়ে আসা উচিত ছিল,' বলল মুসা।

'আজ বরং যাই,' রবিন বলল। 'আরেকদিন আসব।'

'আরে দূর!' হাসলেন প্রফেসর। 'ভেতরে এসো তো! কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

অবাক হয়ে তাঁর জমকাল পোশাকের দিকে চেয়ে রইল কিশোর।

'আসলে বিশেষ লাঞ্চের আয়োজন হয়েছে আজ,' জানালেন মিসেস জিঙ। 'তোমরা আসায় বরং ভালই হয়েছে।'

'আমরা সত্যিই বোধহয় অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম আপনাদের,' লজ্জিত গলায় বলল কিশোর।

'চুপ করো!' কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করলেন মিস্টার জিঙ।

'আমরা বিশ্বাস করি অতিথি হলো ঈশ্বরের প্রতিরূপ,' হেসে বললেন মিসেস জিঙ। 'তোমরা আসায় সত্যিই আমরা খুব খুশি হয়েছি।'

মিসেস জিঙ কিচেনের দিকে চলে গেলেন। প্রফেসর ওদেরকে নিয়ে লিভিং রূমে এসে বসলেন।

'স্যার, আমার আন্টিকে একটা ফোন করা যাবে?' বিনীত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আপনার এখানে আছি জানাতে পারলে ভাল হত।'

'শিয়োর, শিয়োর,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'হলে সেট আছে। কথা বলে এসো।'

কিশোর যখন ফিরে এল রবিন তখন তার গল্পের উপসংহার টানছে, 'এটুকুই জানি আমরা ফিনিক্স সম্পর্কে।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'ফিনিক্সের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতেই আপনার কাছে আসা।'

হাসলেন বৃদ্ধ। 'ফিনিক্সকে নিয়ে প্রচলিত সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনীটা

শোনা যায় চীনাদের মুখে,' শুরু করলেন তিনি। 'চীনাদের বিশ্বাস যে জায়গার আগুন থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে ফিনিক্স, সেখানকার মাটি খুঁড়লে নাকি ধনরত্ন পাওয়া যায়।'

'অদ্ভুত তো!' বলল কিশোর।

'খাইছে!' মুসা বলল।

'ফিনিক্সের ব্যাপারে তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি সত্যি আনন্দিত,' বললেন প্রফেসর। 'আমার মনে হয় তোমরা ফিনিক্সের সন্ধান করছ, তাইনা?'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'চেষ্টা চালিয়ে যাও। হয়তো ওটার সূত্র ধরেই পেয়ে যেতে পারো অমূল্য রত্ন!'

বুককেস থেকে ঢাউস একটা বই বের করে আনলেন প্রফেসর। রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর পাতা উল্টে কিছু একটা বের করে এগিয়ে দিলেন কিশোরদের সামনে।

'ফ্যাঙ হুয়াঙের ছবি,' বললেন তিনি। 'চীনারা ফিনিক্সকে বলে ফ্যাঙ হুয়াঙ।'

কৌতূহলী চোখে ছবিটার দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ওটা আসলে ফিনিক্সের একটা ভাস্কর্যের ফটোগ্রাফ। গায়ের রঙ টকটকে লাল। উভয় ডানায় চারটে করে লম্বা, চওড়া ও মসৃণ পালক। লেজটা অস্বাভাবিক লম্বা। শক্তপোক্ত দু'পায়ের নখর তীক্ষ্ণ ও লম্বা।

'অদ্ভুত!' মন্তব্য করল কিশোর। 'স্যার, ভাস্কর বা ফটোগ্রাফারের নাম নেই কেন?'

'জানি না,' জবাব দিলেন তিনি। 'আমিও খুঁজেছি, পাইনি।'

'ভাস্কর্যটা কোথায় আছে?' মুসার প্রশ্ন।

'তারও উল্লেখ নেই কোথাও।'

'ধ্যাৎ!' রেগে উঠে টেবিল চাপড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

বইটির প্রকাশকের নাম-ঠিকানা টুকে নিল কিশোর। ফটোগ্রাফার বা ভাস্করের পরিচয় জোগাড়ের চেষ্টা করবে।

এসময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস জিঙ। সবাইকে ডাইনিং রুমে যেতে বললেন। লাঞ্চ রেডি।

চীনা রীতিতে সাজানো হয়েছে নিচু ডাইনিং টেবিলটা। ঠিক মাঝখানে হলুদ-সাদা রঙের ফুলের একটা ভাস। তাজা ফুল শোভা পাচ্ছে ওটায়। তিন-সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা কয়েকটি মোমবাতি জ্বলছে টেবিলের এখানে ওখানে। টেবিল ঘিরে বসে পড়ল সবাই।

হঠাৎ ডাইনিং রুম সংলগ্ন কিচেনের দরজা খুলে গেল। মিষ্টি একটি মেয়ে হাসিমুখে ঢুকল ভেতরে। ওর হাতের ট্রেতে সুপের চারটে বাটি।

মিসেস জিঙ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওর নাম নিতজি সিয়ান। প্রফেসর জিঙের এক বন্ধুর মেয়ে, আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানে নিঃসন্তান বৃদ্ধ দম্পতিকে সঙ্গ দিতে এসেছে।

টেবিলে সুপের বাটি রেখে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল নিতজি।

কিসের অনুষ্ঠান জানার কৌতূহল কিশোরের। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নিজে থেকে

বলছেন না, কাজেই জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ করছে।

ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে কিশোর ক্লু খোঁজার চেষ্টা করল, বোঝা যায় কিনা অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য কি। কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো।

ওদিকে মুসা আর রবিন পড়েছে মহা ভাবনায়। চপস্টিক দিয়ে সুপ খাওয়ায় অভ্যস্ত নয় ওরা। কিশোরও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ও লজ্জিত।

কোন বুদ্ধি না পেয়ে অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। জিঙ দম্পতি খেতে শুরু করলে তাঁদের দেখাদেখি খেতে চেষ্টা করবে ওরা। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিশোরদের ভাবনার অবসান ঘটিয়ে প্রফেসর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ল্যাডল্‌স দিয়ে যেতে ভুলে গেছে দেখছি নিতজি।'

ল্যাডল্‌স? জিনিসটা কি ভেবে অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। ডাকার আগেই ল্যাডল্‌স নিয়ে ঘরে ঢুকল নিতজি।

'সরি,' মিষ্টি হেসে বলল সে। 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর, রবিন আর মুসা। কতগুলো কাঠের চামচ নিয়ে এসেছে সে। এগুলোই ল্যাডল্‌স, বুঝল ওরা।

জিঙ দম্পতির সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল তিন গোয়েন্দা।

সুপের পর এল স্ট্যু। মিসেস জিঙ জানালেন ওটা তৈরি হয়েছে চিকেন, ডিম, ডাল, বাদাম আর রাইস দিয়ে। চমৎকার স্বাদ।

এর নাম মৃ গৃ গেই প্যান।

সব শেষে এল ফল। চেনা ফলের পাশাপাশি কিছু অচেনা ফলও এল। একটু একটু করে সব ফলই খেতে হলো কিশোরদের।

খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস জিঙ। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন স্বামীকে। দেখাদেখি কিশোররাও তাই করল।

এখনও ওরা বুঝতে পারছে না কি অনুষ্ঠান পালন করছে চীনা দম্পতি।

অবশেষে রহস্য ভাঙলেন মিসেস জিঙ। জানালেন আজ তাঁর স্বামীর জন্মদিন। 'আমি তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি,' হেসে মিস্টার জিঙকে বললেন তিনি।

তিন গোয়েন্দাও অভিনন্দন জানাল বৃদ্ধকে। তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করল।

'তোমাদেরকে পীচ ফল পরিবেশন করা হয়েছিল,' বললেন মিসেস জিঙ। 'খেয়াল করেছ?'

'জ্বি,' জবাব দিল মুসা।

'জন্মদিনে এই ফল পরিবেশনের পেছনে একটা চীনা সংস্কার আছে। বলা হয় বহু বছর আগে পৃথিবীতে একটা অমর পীচ গাছের জন্ম হয়। ওটা একহাজার বছরে একবার ফল দেয়। জন্মদিনে যে একবার ওই ফল খেতে পারে সে পুরো এক হাজার বছরের আয়ু পায়।'

'রূপকথা!' বিড়বিড় করে বলল রবিন।

'দারুণ তো!' কিশোর বলল।

'তোমাদের আরেকটা চীনা লোকগাঁথা শোনাব যদি তোমরা শুনতে চাও,' মাথা দোলালেন বৃদ্ধ।

'অবশ্যই!' সাগ্রহে বলল কিশোর।

'বহুদিন আগে,' শুরু করলেন প্রফেসর। 'রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করত একটা তারা, নাম ছিল তার ষাঁড় তারকা। সেসময় মানুষ খিদে মেটাত শিকার করা প্রাণীর মাংস খেয়ে। শিকারের খুব অভাব ছিল বলে একদিন খেলে দু'দিন উপোস থাকত সেসময় মানুষ। মানুষের এত দুঃখ কষ্ট সইতে না পেরে স্বর্গদেব আকাশের সেই ষাঁড় তারকাকে একদিন একটা বার্তা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন। বার্তাটি হচ্ছে, মানুষ যেন আর দুশ্চিন্তা না করে। স্বর্গদেব নিজে তাদের জন্যে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ভাল খাবারের ব্যবস্থা করবেন।

'কিন্তু ষাঁড় হলো মোটা বুদ্ধির প্রাণী। নামতে নামতে স্বর্গদেবের বার্তার কথা ভুলে গেল। মানুষকে বলল, 'তোমাদের আর কোন চিন্তা নেই। স্বর্গদেব তোমাদের জন্যে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করবেন।'

ভীষণ ক্ষেপে গেলেন স্বর্গদেব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন আজ থেকে ষাঁড় লাঙল টানবে, যাতে মানুষ সত্যি সত্যি তিনবেলা খেতে পায়।'

'খুব সুন্দর!' কিশোর বলল।

'আমার কাছে চীনা রূপকথার একটা বই আছে,' হাসলেন মিস্টার জিঙ। 'ইচ্ছে করলে নিয়ে পড়তে পারো। ভাল লাগবে।'

'পরে একসময় এসে নিয়ে যাব,' কিশোর বলল।

মিস্টার ও মিসেস জিঙের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীগালে ফিরে এল কিশোররা।

ফিরেই প্রকাশকের কাছে ফোন করল কিশোর। প্রকাশক বইটির সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি ফটোগ্রাফারের ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হলেন না। এমনকি নাম বলতেও নারাজ।

'দেখুন,' উপায় না দেখে বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা জানা খুব জরুরী। আমরা তিন বন্ধু মিলে এক চোরের পেছনে লেগেছি। ওই ব্যাটাকে ধরতে না পারলে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের এক বান্ধবীর কিডন্যাপের ব্যাপারটিও সম্ভবত এর সঙ্গে জড়িত। প্লীজ! আমাদেরকে হেল্প করুন।'

'তুমি বলতে চাইছ আমাদের এক ফটোগ্রাফার চুরি আর কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত?' প্রশ্ন এল ওপাশ থেকে।

'না, না। ওই ফিনিক্স পাখিটি এর সঙ্গে জড়িত। ওটা সম্পর্কে আমাদের তথ্য দরকার।'

রিসিভার চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কারও সঙ্গে কথা বললেন তিনি। তারপর বললেন, 'হ্যালো, ফটোগ্রাফারের নাম ডিক ব্যানারম্যান। ছুটিতে আছেন তিনি।'

হতাশ হলো কিশোর, 'কোথায় পাব তাঁকে?'

'নিউপোর্ট বীচে। উঠেছেন সীগাল মোটেলে।'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কিশোরের।

দশ

খবরটা শুনে অবাক হলো মুসা আর রবিনও। অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যানারম্যানের সংযোগ চাইল কিশোর। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পরও সাড়া পাওয়া গেল না।

'মনে হয় রুমে নেই,' বলল কিশোর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে।

'চলো, নিচে গিয়ে রিসিপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে দেখি,' বলল রবিন।

'চলো।'

নিচে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। রিসিপশনিস্টের কাছে জানতে চাইল ব্যানারম্যানকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

'দাঁড়াও, ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখি,' বলে উঠে দাঁড়াল লোকটি। পাশের একটা রুমের দিকে এগিয়ে গেল। একটু পর ম্যানেজার স্বয়ং বেরিয়ে এল।

হেসে কিশোরের দিকে তাকাল। 'ব্যানারম্যানের অটোগ্রাফ দরকার? নাকি তাঁর ওপরও গোয়েন্দাগিরি...'

'দুটোই,' জবাবে হাসল কিশোর।

তিন গোয়েন্দাকে মোটেলের বাইরে চমৎকার এক ফুলের বাগানে নিয়ে এল ম্যানেজার। ওটার একপাশে কয়েকটা চেয়ার পাতা। ওগুলোর একটায় বসে থাকা এক লোকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে সে বলল, 'উনিই ব্যানারম্যান।'

এগিয়ে গেল ওরা।

ব্যানারম্যান লোকটি যেমন লম্বা তেমন স্বাস্থ্যবান। ধূসর বর্ণের একমাথা ঝাঁকড়া চুল। নাকের নিচে মোটা গোঁপ।

'মিস্টার ব্যানারম্যান,' বলল ম্যানেজার তার ভিআইপি বোর্ডারের উদ্দেশে। 'পরিচয় করিয়ে দিই। এ কিশোর, আমাদের মালিকের বোন পো। আর এরা মুসা ও রবিন, কিশোরের বন্ধু,' কিশোরের দিকে ঘুরে তাকাল ম্যানেজার। 'কিশোর, ইনি ব্যানারম্যান। প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার।'

কিশোরের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে ঝাঁকি দিলেন ব্যানারম্যান। 'নাইস টু মীট ইউ।'

'মিস্টার ব্যানারম্যান,' আবার বলল ম্যানেজার। 'সাবধান! এরা শার্লক হোমসের শিষ্য—ঝানু গোয়েন্দা।'

'আমি চোর না, ডাকাতও না,' হাসলেন ব্যানারম্যান। 'সাবধান হতে হবে কেন?'

'চোর-ডাকাত না হয়েও,' বলল ম্যানেজার, 'গোয়েন্দাদের পাল্লায় পড়লে কেমন লাগে একটু পরেই টের পাবেন, স্যার।'

'আচ্ছা!' বললেন ব্যানারম্যান। 'তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?'

তাঁর পাশে বসে পড়ল তিন গোয়েন্দা। নিজের কাজে চলে গেল ম্যানেজার।

ফিনিক্সের ছবিটার কথা বলল তাঁকে কিশোর। শুধু ছবিটাই আছে কিন্তু এব্যাপারে আর কিছু নেই কেন জানতে চাইল গোয়েন্দা-প্রধান।

'আসলে ওই শিল্পকর্মের মালিকেরই অনুরোধে তাঁর কিংবা আমার কারোই নাম-ঠিকানা দেয়া হয়নি।'

'কেন?' অবাক হলো রবিন। 'দিলে কি হত?'

'কি হত জানি না। তবে যেহেতু তিনি নিষেধ করেছেন তাই দেয়া হয়নি। আমি যদি তাঁর শর্তে রাজি না হতাম, তাহলে হয়তো তিনি তাঁর ভাস্কর্যের ছবিই তুলতে দিতেন না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। কি যেন ভাবছে।

'কোথায় থাকেন উনি?' জানতে চাইল মুসা।

'তোমাদের যদি বলতেই পারতাম তাহলে বইতে ছাপতেও কোন দোষ ছিল না।'

'এটুকু তো বলতে পারেন উনি এখান থেকে কতদূরে থাকেন,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, এটুকু বলা যায়। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আরেকটু যোগ করছি, তাঁর জন্ম প্রাচ্যে।'

তাঁর কাছে ফিনিক্সের মত প্রাচ্যকলার আর কোন নিদর্শন আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

ব্যানারম্যান কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, 'লোকটির ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বললে আমার ধারণা ঠিকই তাঁকে খুঁজে বের করে ফেলবে তোমরা। তবু বলছি...হ্যাঁ, আরও অনেক মূল্যবান শিল্পকর্ম আছে তাঁর কাছে। বেশির ভাগই এশীয়।'

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা।

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা।

'কোন মুকুট দেখেছেন তাঁর কাছে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'প্রাচীন কোন চীনা জমিদারের?'

'না।'

এবার ভিন্ন একটা প্রশ্ন করল তাঁকে মুসা। 'আচ্ছা আপনি যে ফিনিক্সের ছবি তুলেছেন ওটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল?'

প্রশ্নের ধরন দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না ব্যানারম্যান। জবাব দিলেন, 'কালো কাঠ দিয়ে তৈরি একটা স্ট্যান্ডের ওপর।'

হঠাৎ কিশোর বলে উঠল, 'মিস্টার ব্যানারম্যান, কি এমন ক্ষতি হবে তাঁর নাম ঠিকানা আমাদের দিলে?'

'স্রেফ মামলা ঠুকে দেবে আমার বিরুদ্ধে,' হাসলেন ফটোগ্রাফার।

তিন গোয়েন্দা কখনও চায় না ওদের গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্য করতে গিয়ে কারও ক্ষতি হোক। প্রসঙ্গ পাল্টে মিসেস ফিয়োনার অনুষ্ঠান নিয়ে গল্প শুরু করল ওরা।

'আপনি আসছেন তো অনুষ্ঠানে?' কিশোর বলল।

'অবশ্যই!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ফটোগ্রাফার। 'সত্যি বলতে কি আমি

আসলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই এখানে এসেছি। ছবি তুলতে হবে। একটা পত্রিকার কাভার স্টোরি তৈরি করতে হবে। তা তোমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছ নাকি?'

হাসল মুসা। 'আমরা বিচারক নির্বাচিত হয়েছি।'

'বলো কি!' অবাক হলেন ব্যানারম্যান। 'তিনজনই?'

'জ্বি,' মাথা ওপর নিচ করল রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ব্যানারম্যান। 'কঠিন কাজ, কিন্তু সম্মানজনক। দেখো আবার পক্ষপাতিত্ব কোরো না যেন!'

একযোগে হেসে উঠল তিন গোয়েন্দা।

'আচ্ছা, প্রতিযোগী একটি মেয়ে নাকি হারিয়ে গেছে রহস্যজনকভাবে...' হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি।

কিশোর বলল, 'খবরটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই গোপন রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা কিভাবে যেন সবাই জেনে গেছে।'

'এসব খবর বাতাসের আগে ছড়ায়,' বললেন ফটোগ্রাফার।

'স্টেলাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি আমরা,' বলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বিদায় নেয়ার আগে সে ব্যানারম্যানের কাছে জানতে চাইল তিনি সুইঙ নামের কাউকে চেনেন কিনা।

'না। তবে একবার শুনেছিলাম আমাদের পত্রিকার সম্পাদকের কাছে সুইঙ নামের এক লোক প্রাচ্যকলার ওপর একটা লেখা জমা দিয়েছিল। তবে লেখাটা নাকি খুব কাঁচা ছিল। ছাপা হয়নি।'

তিনি কি এখানে কোথাও থাকেন?' প্রশ্ন করল মুসা।

'ঠিক বলতে পারব না।'

মোটেলে ফিরে এল ছেলেরা। ব্যানারম্যানের কাছ থেকে যা যা জেনেছে সবই বলল মিসেস ম্যাডোনাকে।

টেলিফোন বুক ঘেঁটে কিশোর জানাল নিউপোর্ট বীচে তিনজন সুইঙ থাকে।

'কার সঙ্গে আগে যোগাযোগ করব?' মুসা প্রশ্ন করল।

কিশোর জানাল প্রথম সুইঙ একজন ধোপা। কাজেই তাকে আপাতত বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সুইঙের সঙ্গে যোগাযোগের পক্ষপাতি সে।

ওকে সমর্থন করল দুই সহকারী।

ফোন করা হলো দ্বিতীয় সুইঙের বাসায়। ধরল এক মহিলা। জানা গেল সুইঙ তার ছেলে, হকি খেলোয়াড়। বর্তমানে কানাডায় আছে টিমের সঙ্গে। কিশোর বুঝতে পারল রিহাসার্লের সেই বেঁটে ছেলেটি এই সুইঙের কথাই বলেছিল। হতাশ হয়ে তৃতীয় সুইঙের নম্বরে ডায়াল করল ও।

এবারও ধরল এক মহিলা। সুইঙ বাসায় আছে কিনা জানতে চাইতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। জানাল তার ছেলে কয়েকদিন থেকে নিখোঁজ। শেষে যোগ করল, 'তুমি তার কোন খবর জানো, বাবা?'

উত্তেজনা বেড়ে গেল কিশোরের। জবাব দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

'এখনও জানি না, তবে আশা করছি শীঘ্রিই জেনে যাব।'

সুইঙের মা জানাল তার ছেলে শুক্রবার বিকেলে বাইরে বেরোয়। বলে যায় ফিরতে দেরি করবে না। 'কিন্তু সেই যে বেরিয়ে গেল এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি,' শেষে যোগ করল মহিলা। 'এমন কি একটা ফোন পর্যন্ত করেনি।'

শুক্রবার! স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার দিন।

'কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছিল সে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল?'

'কোথায় যাবে বলে যায়নি,' জবাব এল ওপাশ থেকে। 'তবে ওর গাড়ি নিয়ে গেছে।'

'লাইসেন্স নম্বর?' জানতে চাইল উত্তেজিত কিশোর।

'TVZ-774।'

'আচ্ছা, আপনাকে কিছু খবর দিই,' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের। 'নিউপোর্ট বীচ কালচারাল সোসাইটির প্রতিযোগী এক মেয়ে গত শুক্রবার আপনার ছেলের কাছ থেকে একটা চিরকুট পায়। চিরকুটে সুইঙ লিখেছিল মেয়েটি যেন মোটেলের পার্কিঙে রাখা TVZ-774 নম্বর গাড়ির কাছে যায়। মেয়েটি সম্ভবত গিয়েছিল, কারণ তারপর থেকেই সে নিখোঁজ।'

'মাই গড!' বিস্মিত হলো সুইঙের মা। 'অসম্ভব! আমার ছেলে একাজ করতে পারে না। তোমরা চেনো না তাকে। এর মধ্যে মারাত্মক কোন ঘাপলা আছে।'

এরপরই এক ভরাট পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। সুইঙের বাবা, ধারণা করল কিশোর। কিশোরের কাছে স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানতে চাইল সে।

ঘটনাটা আবার বলল কিশোর।

'পুলিশে এখনও খবর দেয়া হয়নি,' জানাল সুইঙের বাবা।

'কেন?' অবাক হলো কিশোর।

'লজ্জায়! পুলিশ ভাববে অতবড় একটা ছেলে নিখোঁজ হয় কিভাবে!'

'কিন্তু,' কিশোর বলল। 'পুলিশ স্টেলা আর সুইঙের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা জেনে গেছে। ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ওরা।'

'স্টেলা আপনার ছেলেকে চিনত না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'তারপরও সে সুইঙের ডাকে সাড়া দিয়েছে তার রহস্যময় চিরকুটের কারণে। সুইঙ লিখেছে যে কোন সময় কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারে স্টেলা। এব্যাপারে ও যদি বিস্তারিত জানতে চায় তাহলে যেন পার্কিঙ লটের TVZ-774 নম্বর গাড়ির কাছে যায়।'

'বুঝতে পেরেছি!' বিষণ্ন কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। 'স্টেলা আর আমার ছেলে একসঙ্গে কিডন্যাপ হয়েছে।'

সুইঙের বাবা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাল কিশোরকে। তেমন ভাল ছাত্র ছিল না সুইঙ। একসময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বেকার হয়ে থাকে বেশ ক'বছর। সম্প্রতি কিছু রহস্যময় লোকের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। তারা কারা জানতে চেয়েও লাভ হয়নি। এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি সুইঙ।

'সুইঙ কি কখনও জিঙ নামের কারও কথা বলেছে আপনাদের কাছে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব এল ওপাশ থেকে। 'কে সে?'
'সম্ভবত নাটের গুরু,' কিশোরও সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।
সুইঙদের বাসার ঠিকানা নিয়ে লাইন কেটে দিল গোয়েন্দা-প্রধান।

এরপর পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসল সে দুই সহকারীকে নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে বিস্তারিত আলোচনা চলল। শেষে রবিন বলল, 'আসলে এখন জিঙকে খুঁজে বের করা দরকার। ফোনবুকে নাম-ঠিকানা না থাকলেও সে যে নিউপোর্ট বীচেই থাকে এ ব্যাপারে আমি শিওর।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাডোনা। রবিনের শেষ কথা শুনেছেন তিনি। পুলিশে ফোন করার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তাই করল কিশোর। লাভ হলো না। জিঙের খোঁজ দিতে পারল না পুলিশ।

'এখন?' চোখেমুখে প্রশ্ন নিয়ে আন্টির দিকে তাকাল কিশোর।

'এখন তোমাদের বিশ্রাম নেয়া উচিত,' হাসলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ। গত কয়েকদিন তোমাদের শরীর আর মাথার ওপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজ শুরু করলে দেখবে মাথা আবার সুন্দর খেলতে শুরু করেছে।'

'কিন্তু আন্টি,' মুসা বলল শুকনো মুখে। 'বিশ্রাম নেয়ার সময় কোথায় আমাদের? স্টেলার যদি কিছু একটা হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ,' যোগ করল কিশোর। 'মিসেস ফিয়োনার মুকুটচোর ধরাছোঁয়ার বাইরে যাওয়ার আগেই তাকে পাকড়াও করতে হবে।'

কিছু না বলে পালা করে কিশোর আর মুসাকে দেখতে লাগলেন মিসেস ম্যাডোনা। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও...একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমার সেই বন্ধু আসতে পারছে না। জরুরী আরেক মিশনে আটকে পড়েছে হঠাৎ করে।'

'মিস্টার টেড উইলিয়াম?'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন দেখাল ম্যাডোনাকে। 'এলে খুব জমত। তোমরা উপভোগ করতে পারতে তার সঙ্গ। ভীষণ রসিক।'

'কপাল খারাপ আমাদের,' কিশোর বলল।

'চলো বীচ থেকে ঘুরে আসি,' হঠাৎ বলে উঠল রবিন। 'স্নান করতে ইচ্ছে করছে খুব।'

প্রস্তাবটা মনে ধরল কিশোরের। 'বেশ।'

বীচে এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। তিনজনেরই পরনে সুইমসুট। অবাক হয়ে ওরা লক্ষ করল বীচ প্রায় জনশূন্য।

পানিতে নেমে পড়ল তিন কিশোর। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি আর সাঁতার কাটায় মগ্ন হয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর উঠে এল একসময়।

পাশাপাশি তিনটে সানট্যান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ওরা। শরীর এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

এগারো

ড্রিম!

গুলির শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল কিশোর। রবিন আর মুসাও জেগে গেছে। কিছু বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা বোকার মত।

তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে নজর বোলাল কিশোর। একটু দূরেই পিস্তল হাতে মুখোশধারী এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার পাশে আছে আরেকজন। বেঁটে, নিরস্ত্র।

রবিন আর কিশোরও দেখতে পেয়েছে ওদের। লাফ দিয়ে একযোগে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

একমুহূর্ত ইতস্তত করল লোকদুটো। তারপর হঠাৎ ঘুরে উল্টোদিকে দৌড়াতে শুরু করল। বীচের প্রান্ত ঘেঁষে চাপা একটা রাস্তা জনবসতির দিকে গেছে। ওদিকেই দৌড়াচ্ছে লোকদুটো।

তোয়ালেটা তুলে নেয়ার জন্যে চেয়ারের ওপর ঝুঁকে এল কিশোর। চেয়ারের ওপর দিকে একটা তাজা ফুটো চোখে পড়ল। গুলির সৃষ্টি, বুঝতে একমুহূর্ত সময় লাগল না গোয়েন্দা-প্রধানের। ওটা আর তিন ইঞ্চি বাঁয়ে সরে এলে ওর মাথায় লাগত।

শব্দ করে ঢোক গিলল কিশোর। গলা শুকিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে উঠল, 'কুইক! ব্যাটারা কোন দিকে গেল জানা দরকার। এসো!'

বলেই সামনে দৌড়াতে শুরু করল কিশোর। প্রায় পাঁচশো ফুট দূরের সেই পথটার মাথায় পৌঁছে হাতে ঠেলা একটা ট্রলি দেখতে পেল ওরা। খালি ওটা।

'এই রাস্তা সোজা মেইন রোডে গিয়ে মিশেছে,' বলল কিশোর। 'রাস্তার দু'পাশে স্থানীয়দের বাসাবাড়ি। মোটেলও আছে দু'একটা। আরও কিছুদূর গিয়ে দেখব?' বলে অনিশ্চিত চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

'যাওয়া যায়,' মুসা বলল।

সামনে এগোল দলটা। পথের ধুলোয় দু'জোড়া খালি পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। চট করে কিশোরের মনে পড়ল ওদেরকে আক্রমণকারী লোকদুটোর কারও পায়েই জুতো ছিল না।

বসে পড়ল কিশোর। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল এক সেট ছাপের মধ্যে একটা পায়ের ছাপ অন্যটার চেয়ে বড়। শুধু তাই নয়, বড় ছাপের আঙুলগুলোও অস্বাভাবিক। দুটো খুব বড়, তিনটে খুব ছোট।

ব্যাপারটা মুসা আর রবিনও খেয়াল করেছে।

'খাইছে!' অবাক কণ্ঠে বলল মুসা। 'মানুষের পা এমন হয় জানা ছিল না আমার।'

রবিন বলল, 'এর মধ্যেও কোন রহস্য থাকতে পারে।'
'কেমন?' জানতে চাইল কিশোর।
'সত্যিকারের পা না-ও হতে পারে,' বলল রবিন। 'হয়তো আর্টিফিশিয়াল।'
'হতে পারে,' কিশোর সায় দিল। 'ক্রিমিনালদের কাজকারবার বোঝা মুশকিল।'
পায়ে চলা চাপা রাস্তার যেখানে এসে পায়ের ছাপ গায়েব হয়ে গেছে, সেখান থেকে দেড় হাত দূরেই মেইন রোড। তাই আর এগোতে পারবে না তিন গোয়েন্দা। কারণ সুইমসুট পরে মেইন রোডে চলা নিষিদ্ধ।

মোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। ঘটনা শুনে মুখ শুকিয়ে উঠল মিসেস ম্যাডোনার। পারেন তো এখনই কিশোরকে রকি বীচে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কিশোর তাঁকে বুঝিয়ে বলল রহস্যের সমাধান না করে সে ক্ষান্ত হবে না।
'তোমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়,' বললেন তিনি। 'কি জবাব দেব আমি মেরির কাছে?'
'কিছুই হবে না,' তাঁকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'এর চেয়েও আরও অনেক বড় বড় বিপদে পড়ার অভ্যেস আছে আমার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আন্টি।'
'গুলিটা যদি আর তিন ইঞ্চি বাঁয়ে সরে আসত?' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মিসেস ম্যাডোনা লোপেজ। 'কি হত তাহলে?'
'কিশোরের কই মাছের প্রাণ, আন্টি,' ম্যাডোনার ভয় দূর করতে কৌতুক করে বলল মুসা। 'ও মরবে না।'
'কিন্তু এমন কাঁচা কাজ তোমরা কিভাবে করলে আমি বুঝে উঠতে পারছি না,' বললেন তিনি।
'কি কাঁচা কাজ?' বুঝতে না পেরে বলল রবিন।
'বীচে ঘুমানো মোটেই উচিত হয়নি তোমাদের। একেবারে আনাড়ির মত কাজ হয়ে গেছে।'
'সরি, আন্টি,' মাথা দোলাল কিশোর। 'আসলে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'
'এমন কাজ আর কোরো না।'
নীরবে মাথা কাত করল তিন গোয়েন্দা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করল কিশোর। ঘটনা জানাল দায়িত্বরত সার্জেন্টকে। সে জানাল পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করার জন্যে এক্ষুনি বীচে লোক পাঠাচ্ছে।
'স্যার,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর। 'ওই অস্বাভাবিক ছাপগুলো সত্যিকারের কিনা আমাদের জানাবেন, প্লীজ!'
'ওকে,' জবাব এল ওপাশ থেকে।
রিসিভার রেখে দিল কিশোর।
মিসেস ম্যাডোনা জানালেন, 'ফিয়োনা জনসন খবর পাঠিয়েছেন তোমাদের কালচারাল সোসাইটিতে যেতে হবে। আজ বিশেষ রিহার্সাল আছে। কিন্তু একা

পাঠাতে আমার ভয় করছে। একজন লোক দিয়ে দেব সঙ্গে?'

'লাগবে না, আন্টি,' কিশোর বলল। 'এরপর কেউ আমাদের পেছনে লাগতে এলে তার খবর আছে।'

'সাবধানে যেয়ো, বাবা।'

'আচ্ছা।'

খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। গন্তব্য কালচারাল সোসাইটি।

রিহার্সাল চলল আড়াই ঘণ্টার মত। আজও কিমের পারফরমেন্স দেখে মুগ্ধ হলো তিন গোয়েন্দা। স্টেলাকে যদি এরমধ্যে উদ্ধার করা না যায়, এই ছেলেই যে 'জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার' হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'হুঁ!' আপনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'স্টেলাকে ফিরে আসতেই হবে।'

পরদিন সকালে বীচের সেই আক্রমণকারীকে খুঁজে বের করার সুন্দর একটা বুদ্ধি খেলে গেল রবিনের মাথায়।

ওর কথামত একে একে শহরের সব জুতোর দোকানে ফোন করতে লাগল কিশোর। এমন অস্বাভাবিক পায়ের কোন খদ্দের আছে কিনা জানতে চাইল। কিন্তু লাভ হলো না। সবাই জানাল এমন কোন খদ্দের নেই তাদের।

'এখন?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মুসা গোয়েন্দা-প্রধানের দিকে।

উত্তরটা যেন তৈরিই করে রেখেছিল কিশোর। বলল, 'এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে নিউপোর্ট বীচে কোন চিরোপডিস্ট আছে কিনা।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এটা আবার কি রে বাবা!'

'পায়ের ডাক্তার।'

'শাবাশ!' বন্ধুর পিঠ চাপড়ানোর জন্যে এগিয়ে এল মুসা। 'দারুণ আইডিয়া!'

ওর হাতের নাগাল থেকে সরে গিয়ে কিশোর ফোনবুকটা তুলে নিল।

'এই শহরে ফুট সার্জন আছে মাত্র একজন,' ওটা ঘেঁটে বলল ও। 'ডক্টর মাসগ্রাভ।'

ডক্টর মাসগ্রাভের চেম্বার।

হাসিখুশি তরুণী রিসিপশনিস্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে মন দিয়ে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। কিশোরদের দেখে ইশারায় বসতে বলল।

একটু পর ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকাল সে।

কিশোর বলল, 'আমরা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সরি!' বলল মেয়েটি। 'আজ আসবেন না উনি।'

'অ,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আচ্ছা, আরেকদিন আসব।' বলে উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও,' বলে উঠল রিসিপশনিস্ট। 'আমি কি কিছু করতে পারি তোমাদের জন্যে?' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি পায়ের অপারেশন করতে পারি না ঠিক, তবে কোন তথ্য যদি তোমরা চাও, হয়তো দিতে পারব। স্যারের নির্দেশ আঠারো

বছরের কম বয়সী কেউ যদি আসে এখানে, তাকে হেল্প করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আমি স্যারের নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করি।'

'আমরা যদি আঠারো বছরের বেশি হতাম?' হেসে বলল মুসা।

'তাহলে যেচে সাহায্য করতে চাইতাম না,' জবাবে রিসিপশনিস্টও হাসল।

কিশোরের বুঝতে অসুবিধে হলো না এই মেয়েকে সব খুলে বললে উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না।

তাই দ্বিধা ঝেড়ে সে বলল, 'বিশেষ এক লোকের ব্যাপারে বিশেষ কিছু তথ্য দরকার আমাদের। লোকটি একবারই এসেছিল আমাদের কাছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'তিনি কি ডক্টর মাসগ্রাভের পেশেন্ট?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'সেটা জানার জন্যেই আমাদের এখানে আসা,' বলল কিশোর।

'আমাদের হাতে অবশ্য একটা ক্লু আছে,' যোগ করল মুসা।

'লোকটির ডান পায়ের আঙুলগুলো অদ্ভুত,' কিশোর বলল। 'তিনটে খুব ছোট, দুটো খুব বড়। ডান পায়ের পাতাটাও বাঁ পায়ের চেয়ে বেশ বড়।'

'বুঝতে পেরেছি কার কথা বলছ,' তিন গোয়েন্দার কানে মধু বর্ষণ করল তরুণী। 'লোকটি চায়নিজ। তবে নাম মনে পড়ছে না। খুঁজে দেখতে পারি যদি তোমরা চাও। আসলে সমস্যা কোথায় জানো, লোকটি সবসময় নগদ পে করে। তাই তার নামে বিল বানানোর প্রয়োজন হয় না।'

কিশোরের হার্টবিট তিনগুণ বেড়ে গেছে। মুসা আর রবিনেরও একই অবস্থা। উত্তেজিত।

কিশোরকে লক্ষ্য করে যে গুলি ছুঁড়েছিল, সে যে মুকুট চুরি আর স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত সে ব্যাপারে মোটামুটি শিওর তিন গোয়েন্দা। তাকে কি শীঘ্রই পাকড়াও করতে চলেছে ওরা?

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে কতগুলো ফাইল ঘাঁটল। শেষে বিষণ্ন মুখে বলল, 'নো লাক, সরি!'

কিশোর বলল, 'আপনি বলেছেন লোকটি চায়নিজ। আসুন আমরা চায়নিজ নাম খুঁজে দেখি। প্রথমেই দেখুন জিঙ নামটি পাওয়া যায় কিনা।'

তাই করল সে। মাথা ডান-বাঁ করে বলল, 'নাহ্, নেই। দাঁড়াও। ডাক্তার সাহেবের একটা প্রাইভেট ফাইল আছে। ওটা একটু দেখে আসি।'

বলে উঠে দাঁড়াল সে। ভেতরে চলে গেল। একটু পর ফিরে এল হাসি মুখে। 'তোমার ধারণাই ঠিক। তার নাম ইয়াঙ জিঙ। শুধু নামটাই পেয়েছি। ঠিকানা নেই। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে লোকটা উপশহরের বিরাট এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। স্যার একদিন বলছিলেন বাড়িটা একবার দেখে আসা উচিত। বাড়িটা নাকি চেরিলাইন রোডে, বিলি'স ফিলিং স্টেশন থেকে একটু দূরে। তোমরা গিয়েছ কখনও ওদিকে?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে এখন যেতে হবে।'

রিসিপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ইয়াঙ জিঙের বাড়ির দিকে ছুটে চলল কিশোরদের গাড়ি।

বারো

'আচ্ছা, মাসগ্রাভ সাহেব যদি জানতে পারেন তাঁর রিসিপশনিস্ট তাঁর অজান্তে অচেনা তিন ছেলেকে তাঁর রোগী সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে?' কিশোরকে প্রশ্ন করল রবিন।

'হয়তো চাকরি যাবে তার।'

'ভাল মানুষরাই দুনিয়ায় বেশি কষ্ট পায়,' মুসা বলল।

'ভুল বললে,' কিশোর বলল। 'কষ্ট তারাই বেশি পায় যারা ভাল এবং বোকা।'

চেরিলাইন রোডে এসে পৌঁছেছে কিশোরদের গাড়ি। সী বীচের দিকে এগিয়ে চলেছে।

'মুসা ডানে নজর রাখো,' বলল কিশোর। 'রবিন বাঁয়ে। মনে রেখো বিলি'স ফিলিং স্টেশন।'

'আচ্ছা,' একযোগে জবাব দিল দুই সহকারী।

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে বিলি'স ফিলিং স্টেশন দেখতে পেল ওরা। ওটা ছেড়ে আরও কিছুটা এগোল।

রাস্তার বাঁয়ে প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ি দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। ওটার পোর্চে দুটো পিলারে একটা নেমপ্লেট দেখা যাচ্ছে।

ডানদিকে কোন বাড়িঘর নেই। ওটায় লেখা: শাউ-লাও।

'এটাই মনে হয়,' বলল কিশোর। গাড়ি থামাল ও। 'চলো, ভেতরে যাই।'

ইতস্তত করতে লাগল রবিন। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ভেতরে ঢুকলে বিপদ ঘটতে পারে।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা ফাঁদে পা দিতে চলেছি,' না বলে পারল না রবিন। 'সামনের আরও ক'টা বাড়ির নেমপ্লেট দেখে আসা উচিত।'

'বেশ,' বলে গাড়ি সামনে বাড়াল কিশোর। কিন্তু লাভ হলো না। কোন বাড়িতেই ইয়াঙ জিঙ অথবা চায়নিজ ধরনের কোন নাম দেখতে পেল না ওরা।

আগের বাড়ির সামনে ফিরে এসে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর।

'ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই,' রবিন বলল অনিশ্চিত কণ্ঠে।

'দেখাই যাক না গিয়ে...' কথা শেষ না করে থেমে যেতে বাধ্য হলো কিশোর।

সন্দেহজনক একটা শব্দ কানে এসেছে ওদের।

হেলিকপ্টারের শব্দ। জানালা দিয়ে একযোগে আকাশের দিকে তাকাল তিন কিশোর। ছোট্ট একটা হেলিকপ্টার চোখে পড়ল ওদের। মনে হলো যেন ওদের গাড়ি লক্ষ্য করেই নেমে আসছে।

'পাইলট মনে হয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল কিশোর। পরক্ষণে গাড়ি স্টার্ট দিল ও। চালাতে শুরু করল।

মনে হলো হেলিকপ্টারটাও ওদের অনুসরণ করছে।

'কিশোর!' প্রায় আঁতকে উঠল মুসা। 'পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারায়নি! আমাদের ধাওয়া করছে! জলদি গতি বাড়াও!'

গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। পাইলটের মতিগতি সত্যিই খারাপ। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দার।

'ব্যাটা পাগল হয়ে গেছে নাকি?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'আমাদেরকে মেরে নিজে কি বাঁচতে পারবে?'

'আসলে সে চায় না অনাহূত কেউ আসুক এখানে,' মুসা বলল। গলা কাঁপছে। 'তাড়াতাড়ি কেটে পড়া উচিত আমাদের।'

রাস্তা ফাঁকা পেয়ে তীরের গতিতে গাড়ি ছোটাল কিশোর। নিরাপদ দূরত্বে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল ও।

'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি,' বলল কিশোর রহস্যময় কণ্ঠে। 'হেলিকপ্টারটার ওই রহস্যময় বাড়িতে ল্যান্ড করার কথা ছিল। আমাদেরকে দেখে ক্ষেপে যায় পাইলট। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর ফন্দি আঁটে।'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'যাবে নাকি আরেকবার? এতক্ষণে নিশ্চই ল্যান্ড করেছে ব্যাটা।'

'যাব,' বলে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল কিশোর।

রবিনের ইচ্ছে করছে না। তবু মুখে কিছু বলল না।

বাড়িটার কাছে একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি দাঁড় করাল কিশোর। নেমে এল তিনজন গাড়ি থেকে।

বাড়ির সামনে চমৎকার একটা ফুলের বাগান। বাগানে বিচিত্র সব ফুলের বাহার।

তিন গোয়েন্দা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সামান্য উত্তরে ড্রাইভওয়ে শুরু হয়ে পোর্চে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কিশোরদের আক্রমণকারী ছোট্ট হেলিকপ্টারটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওরা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চায়,' নীরবতা ভাঙল মুসা। 'তাই আমাদের আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।'

কিশোর বলল, 'এমন কিছু করছে ওরা, যা বাইরের মানুষ জানলে ওদের অসুবিধে হবে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'ইয়াঙ জিঙকে আমরা পেয়ে গেছি।'

ভেতরে ঢুকবে কিনা এ নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। অনুসন্ধান না করেও ফিরে যেতে মন চাইছে না। এতদূর এসে কিছু না জেনে ফিরে যাওয়াটা ওদের ধাতে নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, ডোরবেল বাজাবে।

'যে-ই আসুক,' বলল গোয়েন্দা প্রধান। 'আমরা সরাসরি বলব মিস্টার জিঙের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। পরে কি হবে জানি না, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখছি না।'

'ওরা যদি জানতে চায় আমরা কিভাবে জিঙের ঠিকানা পেলাম, তখন?' রবিনের প্রশ্ন।

'তখন বলব আমরা ডক্টর মাসগ্রাভের কাছ থেকে এসেছি,' জবাব দিল কিশোর।

'ইয়াল্লা!' আইডিয়াটা পছন্দ হলো না মুসার। 'বাচাল রিসিপশনিস্টের কারণে বিপদে পড়বেন মাসগ্রাভ। কাজটা কি ঠিক হবে?'

'এই মুহূর্তে এত চিন্তা করার সময় নেই,' কিশোর বলল। 'পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

রহস্যময় বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। একটু এগোতেই কুকুরের ডাক শুনতে পেল ওরা। এবং কয়েক মুহূর্ত পর দেখল একটা ভয়ঙ্কর অ্যালসেশিয়ান ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'জলদি গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ো!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল কিশোর। নিজেও ছুটল গাড়ির দিকে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ির কাছে পৌছল ওরা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। জানালার কাঁচ তোলাই ছিল।

পর মুহূর্তে পৌছে গেল অ্যালসেশিয়ানটা। জানালায় সামনের দুই পা তুলে দিয়ে গর্জন করতে লাগল বাঘের মত। দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে তীব্র আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ছে।

স্টার্ট দিল কিশোর। কুকুরটা জায়গা থেকে সরল না। কিন্তু কিশোর ওটাকে আঘাত করতে চায় না। তাই আস্তে আস্তে গাড়িটা পেছনে সরিয়ে নিতে লাগল। অনাহূত অতিথিরা চলে যাচ্ছে–বোধহয় বুঝতে পেরেছে সারমেয়টা। সরে গেল।

'যাক!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাঁচা গেল!'

নিরাপদ দূরত্বে এসে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল কিশোর। ঘুরে তাকাল বাড়িটার দিকে। কুকুরটা এখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভেতর থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে না দেখে হতাশ হলো ও। কুকুরটার ওপর বাড়ির মালিকের আস্থা আছে, বুঝল ছেলেরা। অথবা এত ব্যস্ত তারা কুকুরের ডাক কানে যায়নি।

না আসুক, ভাবল কিশোর মনে মনে। আজকের মত নিউপোর্ট বীচে ফিরে যাওয়াই ভাল।

গাড়ি ছোটাল কিশোর।

'মুকুটচোর এই বাড়িতেই থাকে,' বলল রবিন।

'সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ঘণ্টা খানেক আগেও আমার মনে হচ্ছিল রহস্যের সমাধান বুঝি হয়েই গেল।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'কিন্তু রহস্য আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে।'

মোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। ডেস্ক অতিক্রম করে যাওয়ার সময় একটা চিঠি পেল ওরা কর্মরত ক্লার্কের কাছ থেকে।

কিশোর, রবিন, মুসা
তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে নিউপোর্ট বীচে চলে এলাম।
ববি লোপেজ

অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। ববির জানার কথা নয় ওরা এখন নিউপোর্ট বীচে আছে।

নিশ্চয় ম্যাডোনা আন্টি খবর দিয়েছেন ধারণা করল কিশোর। খবর পেয়েই পড়াশুনো রেখে চলে এসেছে সে? আশ্চর্য!

'ববি ভাই এখন মোটেলে নেই, ঠিক?' ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল কিশোর।

'না। বীচে গেছে। বলে গেছে বেশি দেরি করবে না।'

ববির সঙ্গে দেখা না করে বাইরে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে টিভি দেখতে বসল তিন গোয়েন্দা।

ববি লোপেজ ফিরল প্রায় দেড় ঘণ্টা পর। কিশোররা জানতে পারল ববির ভার্সিটি দু'দিনের জন্যে বন্ধ। কিশোরদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে।

'এসে ভালই করেছেন,' কিশোর বলল। 'জটিল এক রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা। আপনি হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

'কি রহস্য?'

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলে গেল কিশোর।

'তোমাদের হেল্প করতে পারলে দারুণ হত,' বলল সে। 'আমিও বিখ্যাত হয়ে যেতাম। কিন্তু পারব না মনে হয়, একদিন পরই ফিরে যেতে হবে আমাকে,' তারপর যোগ করল, 'তবে রহস্যটা সত্যিই জটিল।'

'আজ পর্যন্ত কোন কেসে ব্যর্থ হইনি, ববি ভাই,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আশা করছি এবারও হব না।'

'বেশ,' মাথা দোলাল ববি। 'আমি ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকব। তোমরা বাইরে লুকিয়ে থাকবে। অবস্থা বেগতিক দেখলে...'

'আমরাও ভেতরে ঢুকে পড়ব,' ববির কথা কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। 'এই তো?'

'না। পুলিশে খবর দেবে। ওরা আমাকে আটকালে বরং খুশিই হব। পুলিশকে ওদের গন্ধ শুঁকিয়ে দেয়া যাবে। ঝোলার বেড়াল বেরিয়ে আসবে।'

'কিন্তু পুলিশের আগে আমরাই এই রহস্য ভেদ করতে চাই,' কিশোর বলল।

'পারবে।'

মুসা বলল, 'কিন্তু আপনি জিঙের সঙ্গে কোন অছিলায় দেখা করতে যাবেন?'

'এক কাজ করা যেতে পারে,' বলল কিশোর। 'ববি ভাই, চীনে থাকেন। সবে ফিরেছেন। এপথে যাওয়ার সময় নেমপ্লেট দেখে বুঝতে পেরেছেন এই বাড়ির মালিক চীনা। তাই তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আপনি আগ্রহী।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' বলল ববি।

'ধরা যাক আপনি ভেতরে ঢুকতে পেরেছেন,' ববির দিকে তাকাল মুসা। 'তারপর?'

'আপনার প্রথম কাজ হবে কৌশলে ফিনিক্সের সন্ধান করা,' জবাব দিল কিশোর। 'যদি ফিনিক্স দেখতে না পান তাহলে আশে পাশে যেসব শিল্পকর্ম দেখতে পাবেন সেগুলো নিয়েই কথা বলতে শুরু করবেন। যদি এর মধ্যে সে

আপনাকে সন্দেহ করতে শুরু করে, তাহলে আপনি তাকে প্রফেসর জিঙ সম্বোধন করতে শুরু করবেন। বুঝিয়ে দেবেন আপনি ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন...'

কিশোরকে বাধা দিল ববি, 'হিসেব মিলল না। ভুলে যাচ্ছ কেন, চীনা নাম দেখে কৌতূহলী হয়ে আমি তার বাড়িতে ঢুকেছি। পরে যদি আবার বলি প্রফেসর জিঙ মনে করে ভুল জায়গায় ঢুকেছি—ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'এটুকু রিস্ক নিতে হবে। প্রথমেই যদি আপনি তাকে প্রফেসর জিঙ সম্বোধন করেন তাহলে আপনি ভুল জায়গায় চলে এসেছেন বলে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আপনাকে তাড়িয়ে দেবে ওরা। তাকে তখনই প্রফেসর সম্বোধন করবেন যদি সে আপনাকে সন্দেহ করে।'

'কাজটা রিস্কি,' ববি বলল। 'তবু করব।'

পরদিন সকাল দশটা।

শাউ-লাওতে পৌঁছল কিশোরদের গাড়ি। ঝোপের সামনে থেমে দাঁড়াল ওটা। গাড়ি থেকে নামার আগে কিশোর বলল, 'ববি ভাই, ফিনিক্সটা হয়তো একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওটায় কোন ওপেনিং আছে কিনা খেয়াল করবেন।'

'আই উইল ডু মাই বেস্ট।'

'থ্যাঙ্কস।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাল। গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়িটার পোর্চের সামনে চলে এল ববি।

ঝোপের আড়ালে পনেরো মিনিটের মত ঘাপটি মেরে বসে রইল ছেলেরা।

একসময় বেরিয়ে এল ববি লোপেজ। গাড়িটা এসে থামল ঝোপের সামনে। উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ছুটল ওটা নিউপোর্ট বীচের দিকে।

'কি খবর?' সাগ্রহে জানতে চাইল কিশোর।

'ভাল,' মাথা দোলাল ববি। 'লিভিং রুমের পেছনের অফিসে আছে ফিনিক্সটা। তোমার কথামত কাঠের স্ট্যান্ডের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কথার ফাঁকে আমি তীক্ষ্ণ চোখে খেয়াল করেছি কোন ওপেনিং আছে কিনা। নেই।'

হতাশ হলো তিন গোয়েন্দা।

'অগোচরে আমি স্ট্যান্ড থেকে তুলে ভেতরটাও দেখেছি। ফাঁপা। কিছু নেই ভেতরে।'

'আচ্ছা!' বলল মুসা।

'স্ট্যান্ডের ভেতরটা দেখেছেন?' কিশোর বলল। 'ওটাও ফাঁপা হতে পারে এবং...'

'এই যাহ্!' কিশোরের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ববি। 'ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসেনি!'

'আরেকবার তাহলে যেতে হচ্ছে আমাদের,' মুসা বলল। 'এবার আমরাও ঢুকব।'

'ওকে,' ববি বলল। 'লাঞ্চের পর তোমরা রেডি থেকো। লোকটা কিন্তু আমার

সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছে,' ববি বলল। 'প্রফেসর সম্বোধন করার প্রয়োজন পড়েনি। আমি চীনে থাকি শুনে খুব খুশি হয় সে। কপাল ভাল একবার সত্যি চীনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাই যা জানতে চেয়েছে বলতে পেরেছি। নইলে হয়তো ধরা খেয়ে যেতাম।'

'গুড,' বলল কিশোর।

তেরো

লাঞ্চের পর কিশোররা মোটেল থেকে বেরোতে যাবার মুহূর্তে এসে হাজির হলেন মিসেস ফিয়োনা জনসন। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে।

'খবর আছে কোন?' শুধালেন তিনি তিন গোয়েন্দাকে।

'এখনও নেই,' বলল কিশোর। 'তবে আপনার মুকুট হয়তো আমরা শীঘ্রই উদ্ধার করতে চলেছি।'

'তোমরা পারবে,' ফিয়োনা বললেন। 'আর স্টেলার ব্যাপারটা?'

'ওকেও হয়তো উদ্ধার করতে পারব খুব তাড়াতাড়ি,' বলল রবিন।

'আপনার মুকুটচোরকে পাকড়াও করতে পারলে স্টেলাকেও উদ্ধার করতে পারব,' বলল কিশোর। 'কারণ ঘটনা দুটো একই সূত্রে গাঁথা।'

'গুড।'

ববির সঙ্গে মিসেস ফিয়োনার পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আর মাত্র দু'দিন বাকি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ফিয়োনা। 'অথচ আসল মুকুটটা আমার হাতে নেই। বুঝতে পারছি না কি হবে। এর মধ্যে স্টেলাকে পাওয়া না গেলেও মুশকিল। পাবলিক ওর নিখোঁজ হবার দায় চাপাবে কালচারাল সোসাইটির ওপর। অভিযোগটা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কারণ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেই সে এসেছে নিউপোর্ট বীচে। লোকে বলবে অনুষ্ঠান করার ক্ষমতা আছে সোসাইটির অথচ প্রতিযোগীদের নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতা নেই। এই অপবাদ মেনে নেয়া যায়?'

'দুশ্চিন্তা করবেন না, ম্যাম,' বলল কিশোর। 'আপনার মুকুট আর স্টেলাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।'

'থ্যাঙ্কস আ লট!' হাসার চেষ্টা করলেন মিসেস ফিয়োনা। 'তবে যা-ই করো, সাবধানে কোরো। জীবনের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

বিদায় নিলেন মিসেস ফিয়োনা।

কিশোরদের গাড়ি আবার ছুটে চলল শাউ-লাও'র দিকে।

কুকুরটাকে দেখা গেল না এবার। কিশোরদের ভেতরে ঢুকতে কোন সমস্যা হলো না। তবে ইয়াঙ জিঙকে তেমন একটা আন্তরিকও মনে হলো না।

'আপনার ফিনিক্সটা দেখে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছি,' হেসে বলল ববি। 'আমার বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'দুঃখিত,' মুখ খুলল জিঙ। 'ওটা নেই। বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।'

'অ্যা!' বিষম খেল ববি। 'বলেন কি! এরই মধ্যে! অত সুন্দর জিনিসটা...!'

হতাশ হয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। তীরে এসে এভাবে তরী ডুববে কল্পনা করতে পারেনি ওরা।

'যিনি ওটা কিনেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?' জানতে চাইল ববি।

'না।'

'কেন?'

'ক্রেতার নাম বলা যাবে না, নিষেধ আছে।'

বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে জিঙ। বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা এখন বিদায় নিলে খুশি হয়।

এবার সরাসরি তাকে আঘাত করল কিশোর। 'সুইঙ নামের একটা ছেলে আপনাদের সঙ্গে কাজ করত। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ক'দিন ধরে। ছেলের শোকে বাবা-মা পাগল-প্রায়। আপনারা বলতে পারেন সে কোথায় থাকতে পারে?'

'তাই নাকি?' যেন অবাক হয়েছে এমন ভান করল সে। 'জানি না তো! বেশ কিছুদিন থেকে তার সঙ্গে আমাদের দেখা নেই।'

সদর দরজার কাছে এসে থেমে দাঁড়াল কিশোর। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল জিঙের দিকে। বলল, 'আমার মনে হয় আপনি কোরিয়ান, ঠিক?'

একটু যেন চমকে উঠল জিঙ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক। জন্মসূত্রে কোরিয়ান, চীনেই বড় হয়েছি। কিভাবে বুঝলে তুমি?'

কিছু না বলে হাসল কিশোর। বেরিয়ে এল শাউ-লাও থেকে।

মোটেলে ফেরার সময় রবিন বলল, 'কিভাবে বুঝলে জিঙ কোরিয়ান?'

'কিমের পারফরমেন্স দেখার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন চায় না স্টেলা "জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার" অ্যাওয়ার্ড জিতুক। সে-ই হয়তো স্টেলার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটি অবশ্যই কোরিয়ান, যেহেতু কিমও কোরিয়ান।'

চোদ্দ

ওরা মোটেলে ফিরতেই মিসেস ম্যাডোনা এগিয়ে এলেন। কি হলো জানতে চাইলেন।

হতাশ কণ্ঠে মুসা বলল, 'তীরে এসে তরী ডুবল মনে হয়!'

'ব্যাটা ফিনিক্সটা সরিয়ে ফেলেছে!' রবিন বলল।

কিশোর কিছু না বলে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। কি যেন ভাবছে আনমনে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স। ক্যাপ্টেনের রুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। নিউপোর্ট বীচে

আসার পরপরই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তিন গোয়েন্দার। ওরা শখের গোয়েন্দা শুনে খুশি হয়েছেন তিনি। বলেছেন কোন দরকার পড়লে ওরা যেন তাঁর কাছে আসতে ইতস্তত না করে।

আজ দরকার পড়েছে। তাই তাঁর মুখোমুখি এখন তিন গোয়েন্দা।

'কি খবর?' ওদের দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন তিনি।

'মোটামুটি,' জবাব দিল কিশোর। 'আচ্ছা, স্যার, এই এলাকায় কোন কোরিয়ান থাকে?'

'হ্যাঁ। দুটো কোরিয়ান পরিবার আছে এখানে। শী লিজ আর লিয়ান ভিজ।'

'কোথায় থাকে ওরা?'

'নিউপোর্ট বীচের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। ওরা ভাল বলেই জানে কর্তৃপক্ষ।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

বিকেল হয়ে গেছে। কালচারাল সোসাইটির রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। সেদিকে চলল ছেলেরা।

জায়গামতই পাওয়া গেল কিমকে। কোরিয়ান কারও সঙ্গে ওর পরিচয় আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

দুটো পরিবারের সঙ্গে ওদের পরিচয় আছে বলে জানাল কিম। 'এই দুই পরিবারের একটির বদৌলতেই আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চলেছি।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী হয়ে উঠল গোয়েন্দা-প্রধান।

'লিয়ান ভিজদের খুব পছন্দ আমার,' বলল কিম। 'তাঁরা আমার বাবা মাকে রাজি না করালে আমি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারতাম না।'

'অন্যটি?' রবিন প্রশ্ন করল।

'শী লিজদের একদম দেখতে পারি না আমি,' নিঃসঙ্কোচে বলল কিম। 'ভীষণ সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ ওরা।'

ভুরু কুঁচকে উঠল কিশোরের। 'তাই নাকি?'

'আমেরিকায় থেকে প্রচুর টাকা কামিয়ে কোটিপতি হয়েছে ওরা,' মাথা দুলিয়ে বলল কিম। 'অথচ আমেরিকা দেশটাকে দেখতে পারে না ওরা। কোরিয়া ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

কিমের কথায় উত্তেজনা বেড়ে গেল তিন গোয়েন্দার।

পনেরো

মোটেলে ফিরতে না ফিরতেই প্রফেসর জিঙের ফোন এল। কণ্ঠ শুনে বেশ উত্তেজিত মনে হলো তাঁকে।

'কিশোর!' বললেন তিনি। 'তোমার বন্ধুদের নিয়ে জলদি আমার বাসায় চলে এসো। আমার কাছে ফোনে একটা মেসেজ এসেছে। আমার ধারণা ওটা তোমাদের তদন্ত সংশ্লিষ্ট। এক ঘণ্টা পর লোকটি আবার ফোন করবে। সম্ভব হলে তার আগেই চলে এসো তোমরা।'

'আমরা এক্ষুনি আসছি, স্যার।'

প্রফেসর জিঙের ড্রইং রুম। 'এক লোক একটু আগে ফোন করেছিল আমার কাছে,' শুরু করলেন প্রফেসর। বলল, ' "আমি ক্যাপ্টেন বলছি। অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে আপনার আদেশ" । লোকটা আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিল।'

একটু থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'লাইন কেটে দেয়ার আগে সে বলেছে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার রিপোর্ট করবে।'

প্রফেসরের সন্দেহ কিশোররা যে ইয়াঙ জিঙকে খুঁজছে লোকটির উদ্দেশ্য মেসেজটা তাকে দেয়া। বিরাট বড় ভুল করে ফেলেছে সে।

'কিন্তু এত বড় ভুল কিভাবে করল সে?' কিশোর জানতে চাইল।

'ক্রিমিনাল ইয়াঙ জিঙের নম্বর টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নেই,' বললেন প্রফেসর। 'এই কথাটা হয়তো জানে না সে। ডিরেক্টরিতে আমার নম্বর পেয়ে আমাকেই ক্রিমিনাল মনে করেছে।'

ঠিক একঘণ্টার মাথায় ফোন বেজে উঠল আবার।

কাঁপা হাতে রিসিভার তুললেন মিস্টার জিঙ। এবারও ক্যাপ্টেন বলে নিজের পরিচয় দিল লোকটি। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'সুইঙ আর মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিয়েছি সাগরে। ওরা এখন তীর থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার দূরে,' হাসল লোকটা। 'পানি কিংবা খাবার কিছুই নেই ওদের সঙ্গে।' পর মুহূর্তে লাইন কেটে দিল সে।

ঘটনা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সাগর তীর থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার দূরে আছে সুইঙ আর স্টেলা!

'স্যার!' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'খবরটা এখনই কোস্টগার্ডদের জানিয়ে দিন।'

ঝড়ের বেগে মোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। রিয়া মর্টন আর তার বন্ধু রিক বেনসনকে ডেকে পাঠাল কিশোর। মিসেস ম্যাডোনা এলেন ওদের রুমে। ঘটনা শুনে বললেন, 'স্টেলার বাবা মাকে ঘটনাটা জানানো দরকার।'

'আপনি তাই করুন, আন্টি,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমরা ওদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি।'

'আমি জানি তোমাকে বাধা দিয়ে কাজ হবে না,' বললেন মিসেস ম্যাডোনা। 'যা-ই করো, সাবধান থেকো।'

রিয়া আর রিককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

ডকে পৌঁছে একটা ফাস্টফুডের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। কিছু খাবার আর পানি কিনে নিয়ে ফিরে এসে দেখে এর মধ্যে রবিন একটা কেবিন ক্রুজ ভাড়া করে ফেলেছে। উঠে পড়ল দলটা।

'কোনদিকে যাব?' প্রশ্ন করল কিশোর হুইলে বসে।

'ব্যাপারটা নিয়ে আগেই ভাবা উচিত ছিল,' জবাব দিল মুসা।

'আমাদের হাতে আটটা চয়েস আছে,' রবিন বলল। 'উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম...'

'বুঝেছি,' ওকে থামিয়ে দিল কিশোর। একটু ভেবে আবার বলল, 'আমার ধারণা স্টেলা আর সুইঙকে ইঞ্জিনবিহীন বোটে তুলে দেয়া হয়েছে। বাতাস ওদের যেদিকে টেনে নিয়ে গেছে, সেদিকেই গেছে ওরা।'

'ঠিক!' একযোগে একমত হলো রবিন আর মুসা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল কিশোর। ক্রুজার ছুটল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই ভাবছে অপহৃত স্টেলা ও সুইঙের কথা। পারবে ওরা সময়মত ওদের উদ্ধার করতে?

ষোলো

'আচ্ছা!' হঠাৎ বলে উঠল রিয়া। 'জিঙ ধোঁকা দেয়নি তো আমাদের?'

'ইয়াল্লা!' আঁৎকে উঠল মুসা। 'এই চিন্তা তো মাথায় আসেনি আমাদের!'

'ওসব নিয়ে এখন ভেবে আর লাভ নেই,' পাত্তা দিল না কিশোর। 'স্টেলা আর সুইঙকে উদ্ধার করার চিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় এনো না এখন।'

বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল কিশোর। 'ঝড় উঠবে!' বলল সে রুদ্ধশ্বাসে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয়ে জমে গেল সবাই। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে পুব দিক।

'শিগ্‌গির ক্রুজার ঘুরিয়ে দাও!' ভীত কণ্ঠে বলল রিক।

'ভয় পেয়ো না, রিক,' বলল কিশোর। 'আমরা ফিরে গেলে স্টেলা আর সুইঙের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখো একবার।'

'গতি বাড়ানো যায় না?' কিশোরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল মুসা।

'চেষ্টা করে দেখি,' এক্সিলারেটরে চাপ বাড়াতে শুরু করল কিশোর।

ক্রুজারের রেডিয়ো অন করে দিল রিয়া।

ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়ার পর উপস্থাপক জানাল, সাগরে একজোড়া ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে। কোন বোট ওদের উদ্ধার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়।

তিন গোয়েন্দা বুঝতে পারল কোস্টগার্ডরা প্রফেসর জিঙের কাছ থেকে সুইঙ আর স্টেলার খবরটা পেয়ে গেছে।

'স্টেলা আর সুইঙের নাম বলল না কেন উপস্থাপক?' প্রশ্ন করল রিক।

'ওদের নিরাপত্তার খাতিরে,' জবাব দিল কিশোর। 'পুলিশ চায় না ভিলেনরা সচেতন হয়ে যাক।'

কেবিনে ঢুকে বিনকিউলার খুঁজতে লাগল রিয়া। ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে একটার জায়গায় দুটো পেয়ে গেল। বেরিয়ে এসে একটা দিল মুসাকে। একটা রবিনকে।

বিনকিউলারের ভেতর দিয়ে সামনে তাকাল মুসা আর রবিন। খুশি হওয়ার

মত কিছু চোখে পড়ল না।

আকাশের অবস্থা সুবিধের নয়। এক কোণে নিস্তেজ সূর্য হাসছে অন্যদিকে মেঘের পাহাড়। সাগরের বুক চিরে ছুটছে ক্রুজার।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে এর মধ্যে। বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আঁধার ঘনিয়ে এল। কেবিনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে রিয়া আর রিক। ভয়ে মুখ শুকিয়ে কাঠ। মুসা আর রবিনের অনুসন্ধানী চোখ বিনকিউলারের ভেতর দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্টেলা আর সুইঙকে।

থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছে আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ওই তো! একটা বোট! কেবিন নেই!'

'কোন দিকে?' কিশোর জানতে চাইল।

'পুব দিকে!'

ওদিকে ক্রুজার ঘুরিয়ে দিল কিশোর। ঝাঁকি খেল ক্রুজার। জায়গা নিয়ে ঘুরতে লাগল ধীরে ধীরে।

আবছা আঁধারে সামনে একটা বোটের ছায়া দেখতে পেল ওরা। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দুলছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। আরও কাছে এগিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল বোটটা খালি।

'ঢেউয়ের তোড়ে পানিতে ছিটকে পড়ে গেছে ওরা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রবিন।

'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এখন?'

'বোটের চারপাশটা খুঁজতে হবে,' জবাব দিল কিশোর।

কেবিনের ভেতর থেকে দুটো টর্চ নিয়ে এল রিয়া। আলো ফেলে খুঁজতে লাগল। কিশোর ক্রুজারের আলো ফেলেছে বোটটার ওপর। ফলে বোট ও ওটার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণের কোন সাড়া নেই আশেপাশে।

'স্টেলা-আ-আ...! সু-উ-উ-ইঙ...!' একযোগে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল রিয়া ও রিক।

লাভ হলো না। কোন সাড়া নেই। কানে আসছে শুধু বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দ।

'ওটা কি!' কিছু একটা দেখতে পেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রিক।

একযোগে টর্চের আলো ফেলল মুসা আর রবিন।

একমুহূর্তের জন্যে একটা হাত দেখতে পেল ওরা। পানি থেকে জেগে উঠেই পর মুহূর্তে তলিয়ে গেল।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ক্রুজার ডানে ঘুরিয়ে দাও!'

তাই করতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল কিশোর। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বেশি কাছে নেয়া যাবে না। ক্রুজারের ধাক্কায় আহত হতে পারে মানুষটা।'

'যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে তাকে!' ভীত কণ্ঠে বলল রিয়া।

যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে আসা হলো ক্রুজার।

'সাঁতরে গিয়ে লোকটাকে উদ্ধার করে আনতে হবে,' বলল কিশোর। 'আর এগোনো যাবে না!'

ঝাঁপ দিল মুসা আর রবিন। রিয়া আর রিকও নামতে যাচ্ছিল। বাধা দিল কিশোর। 'তোমরা নেমো না!'

'দু'জনের পক্ষে কাজটা কঠিন,' বলল রিয়া। 'তাহলে তুমি নামো, কিশোর।'

'ক্রুজার সামলাবে কে? তোমরা পারবে?'

'না! আমাদের নামতে দাও, প্লীজ! আমরা ভাল সাঁতার জানি। ঝড় থেমে গেছে। কোন অসুবিধে হবে না।'

এতক্ষণে কিশোর খেয়াল করল ঝড় সত্যি থেমে গেছে। আর আপত্তি করল না ও।

ডুবু ডুবু মানুষটার কাছে পৌঁছল চার কিশোর-কিশোরী। ধরাধরি করে টেনে নিয়ে সাঁতরে চলল ক্রুজারের দিকে।

কিশোর ওপর থেকে ক্রুজারে আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল দৃশ্যটা। যাকে নিয়ে বোটের দিকে সাঁতরে আসছে মুসারা, তার বয়স খুব বেশি নয় আন্দাজ করল কিশোর। তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না।

যুবকটিকে ক্রুজারের ডেকের কাছে নিয়ে এল ওরা। কিশোর হুইল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল। 'মুসা, তুমি ওপরে উঠে আমাকে হেল্প করো,' বলল কিশোর।

তাই করল মুসা। নিচ থেকে তিনজনের ঠেলা আর ওপর থেকে কিশোর-মুসার টানে শীঘ্রি ক্রুজারে উঠে এল যুবকের প্রায় অসাড় দেহ।

'আমি সুইঙ!' বলল সে কোনমতে। 'স্টেলাকে বাঁচাও!'

'কোথায় সে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

সুইঙ কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'বোট থেকে পড়ে যাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমরা।'

এর মধ্যে ওপরে উঠে এসেছে বাকি তিনজন।

রবিন আর মুসা টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগল চারপাশে। কিশোর খালি বোটটাকে ঘিরে ক্রুজার চালাতে লাগল ধীরে ধীরে।

'বেঁচে থাকলে নিশ্চই আমাদের দেখতে পাবে স্টেলা,' বলল রিক। 'আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে তাহলে।'

স্টেলার নাম ধরে ডাকতে লাগল রিয়া ও রিক।

একটু পরই একটা হাত নজরে পড়ল রবিনের। 'ওই তো!' চেঁচিয়ে উঠল ও। মুহূর্তের জন্যে ওপরে উঠে পানিতে আছড়ে পড়ল হাতটা।

সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা, রবিন, রিয়া ও রিক।

'বেঁচে আছে!' স্টেলার কাছে পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠল রিয়া।

সতেরো

স্টেলা আর সুইঙকে উদ্ধার করে নিয়ে সীগালে ফিরে এসেছে কিশোররা। এর

মধ্যে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে স্টেলা আর সুইঙ।

'স্টেলাকে কিডন্যাপ করেছিলে কেন?' সুইঙকে প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমি কিডন্যাপ করিনি,' জবাব দিল সুইঙ। 'কিডন্যাপারদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিশোর,' মুখ খুলল স্টেলা। 'সুইঙ আমাকে কিডন্যাপ করেনি। ভয়ঙ্কর ওই লোকগুলো আমাদের দু'জনকেই সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার পর বুঝতে পারি আসলে সুইঙের কোন দোষ নেই। সে বরং ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।'

মুসা বলল, 'মোটেলে ফ্লাওয়ার ভাসে তোমার রেখে যাওয়া চিরকুটটা আমরা পাই। ওটা দেখেই...'

'ওটা সুইঙই লিখেছিল,' মুসার কথা কেড়ে নিয়ে বলল স্টেলা। 'কিন্তু ওর কোন দোষ নেই। আচ্ছা, আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে জানলে কি করে তোমরা?'

প্রফেসর জিঙের কাছে জনৈক ক্যাপ্টেনের দেয়া মেসেজের কথা ওদের জানাল কিশোর।

'ওহ্! স্বয়ং ঈশ্বর বাঁচিয়েছে আমাদের,' শুকনো কণ্ঠে বলল স্টেলা।

সুইঙ বলল, 'তোমরা না থাকলে এতক্ষণে সলিল সমাধি হত আমাদের।'

ঠিক হলো আপাতত স্টেলা আর সুইঙ সীগালে অবস্থান করবে।

সুইঙ ও স্টেলার বাবা-মা আর মিসেস ফিয়োনাকে খবর দেয়া হলো স্টেলা আর সুইঙকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়লেন সবাই।

মেয়েকে ফিরে পেয়ে কেঁদে ফেললেন মিস্টার ও মিসেস গর্ডন।

সুইঙের গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিলেন ওর মা। চোখে পানি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সুইঙ।

'চুপ করে আছিস কেন?' বললেন ওর বাবা। 'কথা বল। খুলে বল সব।'

'আমি মাঝে-মধ্যে জিঙের এটা ওটা করে দিতাম,' শুরু করল সুইঙ। 'কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারিনি সে খারাপ মানুষ। যখন বুঝতে পারলাম তখন আর সরে আসার উপায় ছিল না। ওরা আমাকে মেরেই ফেলত তাহলে। এক সময় বুঝতে পারলাম মিসেস ফিয়োনার মুকুটটা সেই চুরি করেছে।

'একদিন আড়ি পেতে আমি ওদের কথা শুনি। জানতে পারি সীগালের এক পোর্টারের কাছ থেকে ওরা শুনেছে কিশোর, মুসা আর রবিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিচারক নির্বাচিত হয়েছে। সেই পোর্টারের কাছ থেকেই ওরা জানতে পারে তোমরা শখের গোয়েন্দা। তোমাদের ওপর নজর রাখতে শুরু করে সে।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করব,' বলে চলেছে সুইঙ। 'তবে বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা তোমাদের জানানো দরকার। কিন্তু কিভাবে?

'কালচারাল সোসাইটিতে গিয়ে একে-ওকে দেয়ার নাম করে বেশ কিছু নিমন্ত্রণপত্র জোগাড় করলাম। তারপরের ঘটনা তোমরা জানো।'

'আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতে তুমি,' কিশোর বলল।

'চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি,' জবাব দিল সে। 'জিঙের লোকেরা নজর রাখছিল আমার ওপর। সারাক্ষণ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।'

'ফোন করতে পারতে,' মুসা বলল।

'চেষ্টা করেছি। পারিনি। বাসায় একমাত্র টেলিফোন সেটটা বাবার ঘরে। বাইরে থেকে করার উপায় ছিল না জিঙের লোকদের ভয়ে। তাছাড়া জিঙের কোন না কোন কাজে আমাকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হত।

'যাহোক, একদিন আবার আড়ি পেতে শুনলাম ওদের কথা। জানলাম স্টেলাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেবে না ওরা। প্রথমে ভয় দেখাবে। প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে বলবে। কাজ না হলে দরকার হলে কিডন্যাপ করবে। এবার আর আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হলো না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি ছুটলাম ওকে সাবধান করতে। মেসেজ পাঠালাম ওকে। স্টেলা আমার মেসেজ পেয়ে পার্কিঙ লটে আমার গাড়ির কাছে এল। কিন্তু সেই সময় জিঙের লোকদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম আমরা। আমাদের নাকে রুমাল ঠেসে ধরল তারা। জ্ঞান হারালাম আমরা। যখন ফিরল বুঝতে পারলাম ছোট্ট একটা রুমে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমরা বন্দি। পরে বুঝতে পেরেছি শাউ-লাওয়ের দোতলায় এক রুমে বন্দি ছিলাম।'

'কি সাংঘাতিক!' বিড়বিড় করে বললেন মিসেস ফিয়োনা।

'সকালে আর রাতে একটা করে রুটি দিত খেতে,' বলে চলেছে সুইঙ। 'খাইয়ে আবার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে চলে যেত। দিনে একবার মাত্র আমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিত কিছু সময়ের জন্যে। আমরা ওইটুকু সময় বন্ধ ঘরের মধ্যেই হাঁটাচলা করে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতাম।

'কিশোর, তোমরা যখন শাউ-লাওতে গেলে তখন ভড়কে গেল জিঙ। তোমরা পুলিশে খবর দিলে ব্যাটার বারোটা বেজে যাবে বুঝতে দেরি হলো না তার। কারণ তখনও আমরা শাউ-লাওয়ের এক ঘরে বন্দি। তাই সে আমাদের অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তখন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি ওরা আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু স্টেলা আশাবাদী ছিল। ও জানাল মোটেলে আমার চিরকুটটা এই আশায় বুদ্ধি করে রেখে এসেছে বিপদে পড়লে যেন তোমরা উদ্ধার করতে পার। ও যদি ওটা রেখে না আসত তাহলে এতক্ষণে আমাদের সলিল সমাধি হয়ে যেত।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুইঙের কথা শুনছিল সবাই।

সে থামতে কিশোর জানাল, 'জিঙের বাড়ি থেকে স্ট্যান্ডসহ ফিনিক্সটা উধাও হয়ে গেছে।'

'ওটা খুঁজে বের করতে না পারলে মুকুটটা পাওয়া যাবে না,' সুইঙ বলল। 'ওরা বলাবলি করছিল যেখানে ফিনিক্স সেখানেই মুকুট। কাজেই মুকুট উদ্ধার করতে হলে ওটা খুঁজে পেতেই হবে।'

ঘণ্টাখানেক পর খবর এল মিস্টার গর্ডনের ইনফরমেশন পেয়ে জিঙকে সদলবলে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে ফিনিক্স সম্পর্কে কোন তথ্য যোগাড়

করা সম্ভব হয়নি। এব্যাপারে মুখ খুলছে না জিঙ।

রাতে খাওয়া সেরে সবে নিজেদের ঘরে এসে বসেছে কিশোর, মুসা আর রবিন। এমন সময় মিসেস ফিয়োনার ফোন এল।

'তোমাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানানোর জন্যে ফোন করেছি,' ওপাশ থেকে বললেন তিনি।

'দরকার ছিল না, ম্যাম,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'একটা টেনশন থেকে তোমরা আমাকে মুক্তি দিয়েছ।'

'অন্য টেনশন থেকেও শিগ্‌গির মুক্তি পাবেন,' হেসে বলল কিশোর। 'অনুষ্ঠানের আগেই আমরা আপনার মুকুট উদ্ধারের যতটা সম্ভব চেষ্টা চালাব।'

'থ্যাঙ্কস, তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে।'

টেলিফোন রেখে দিলেন ফিয়োনা।

'কোথায় খুঁজবে মুকুট?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আমার মনে হয় জিঙ ও তার লোকেরা শী লিজের হয়ে কাজ করছে,' বলল কিশোর।

'ওই লোকটার কথা বলছ যাকে অপছন্দ করে কিম?' মুসা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কিম বলছিল লোকটা গোঁড়া দেশপ্রেমী। সে নিশ্চই চাইবে না স্টেলা তার দেশের ছেলে কিমকে হারিয়ে জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার শিরোপা জিতুক।'

'ঠিক,' সায় দিল রবিন।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'চলো।'

বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে অন্ধকার। মিসেস ম্যাডোনার গাড়িতে চেপে বসল।

নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল গাড়ি।

'রবিন, তুমি গাড়িতে বসে থাকবে,' কিশোর বলল। 'আমি আর মুসা ঢুকব ভেতরে। আমাদের ফিরতে দেরি হলে বুঝবে বিপদে পড়েছি আমরা।'

ধীর পায়ে নেমে সদর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল মুসা আর কিশোর। ডোরবেল বাজাল কিশোর। কিছুক্ষণ পর দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি দিল এক লোক। দেখলেই বোঝা যায় কোরিয়ান। শী, ধারণা করল দুই গোয়েন্দা।

আরেকটু খুলে গেল দরজা। শীর পাশে এক মহিলাকে দেখতে পেল কিশোর ও মুসা। তার স্ত্রী হবে হয়তো।

'গুড ইভিনিং,' হেসে বলল কিশোর। 'আমরা কিমের বন্ধু। ভেতরে আসতে পারি? কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

জবাবের অপেক্ষা না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। প্রথমেই বিশাল এক হল। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। ভেতরে ঢোকা দরকার। চিন্তা চলছে মাথায়।

মুসা বলল, 'আপনারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসছেন না?'

'অবশ্যই!' জবাব দিল শী।

ওদের দেখে যে খুব একটা খুশি হয়নি সে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না

কিশোরের। দ্রুত রুমের চারদিকে নজর বোলাতে লাগল ও। কেন যেন কিশোরের মন বলছে সেন্ট্রাল হলের শেষ মাথায় যে রুমটা আছে, ওটায় যেতে পারলে...ভাবনাটা শেষ করতে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে ওই রুমেরই দেয়ালে টাঙানো দারুণ একটা ছবি দেখতে পেয়েছে ও। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি খেলে গেছে মাথায়।

'দারুণ ছবি তো!' বলেই সেদিকে ছুটল কিশোর। ঘরের দেয়ালে, ফায়ারপ্লেসের ওপর একটা ওরিয়েন্টাল ল্যান্ডস্কেপ ঝুলছে। মুগ্ধ চোখে ওটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর।

ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, শী আর তার স্ত্রী। দুই গোয়েন্দাকে বাধা দেয়ার সুযোগই পায়নি তারা। দু'জনই উদ্বিগ্ন।

ছবিটা আসলেই মুগ্ধ করার মত। এবং কিশোর, মুসা সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

একটু পর ঘোর কাটতে রুমের চারদিকে নজর বোলাতে গিয়েই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেল কিশোর।

রুমের এক কোনায় স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে টকটকে লাল ফিনিক্সটা।

দুই গোয়েন্দা একযোগে ছুটল ওটার দিকে।

'ওয়াও! কি অদ্ভুত!' অবাক হওয়ার ভান করে কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে ফিনিক্স, তাইনা?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল শী'র দিকে।

'আমারও তাই মনে হয়,' রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ পেল শী'র কণ্ঠে।

দেয়াল থেকে একটু দূরে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডটা। ওটাকে ঘিরে হাঁটতে লাগল কিশোর। একসময় থেমে দাঁড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল ওটার কাছে। হাত বাড়িয়ে দিল। স্ট্যান্ডটার খোদাইকর্ম ছুঁয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা ফাটল মত দেখতে পেল কিশোর ওটার পেছন দিকে।

বাধা দেয়ার সময় পেল না কিংকর্তব্যবিমূঢ় শী।

তার আগেই কিশোর ওটায় চাপ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু একটা শব্দ তুলে পাশে রাখা একটা কেবিনেটের দরজা খুলে গেল। কিশোরের বুঝতে বাকি রইল না বিশেষ এক কৌশলে তৈরি করা হয়েছে এই লক। কেবিনেটের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ঝলমলে একটা জিনিস।

মিসেস ফিয়োনা জনসনের মুকুট!

তারপর?

মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এল কিশোর আর মুসার নাকে। আচমকাই তন্দ্রা এসে গেল ওদের। লুটিয়ে পড়ল।

আঠারো

প্রায় একই সঙ্গে জ্ঞান ফিরল কিশোর আর মুসার। ধড়মড় করে উঠে বসল কিশোর। রবিন দাঁড়িয়ে আছে ওদের পাশে। চারদিকে নজর বুলিয়ে কিশোর

বুঝতে পারল এটা শী'রই কোন রুম হবে। চার দেয়ালেই টাঙানো আছে নানা শিল্পকর্ম।

এর মধ্যে মুসাও উঠে বসেছে, তবে মাথা এখনও ঝিমঝিম করছে ওর।

'তুমি ভেতরে ঢুকলে কখন?' রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর। 'শী কোথায়?'

পাশের কাউচে বসে পড়ল রবিন। 'গাড়ির ভেতরে বসে থাকতে থাকতে,' শুরু করল ও, 'একসময় অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। বুঝতে পারলাম বিপদে পড়েছ তোমরা। গাড়ি থেকে নেমে পায়চারি শুরু করলাম। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই সময় দু'জন পুলিশকে যেতে দেখে দৌড়ে রাস্তার পাশে চলে যাই। হাতের ইশারায় তাদেরকে থামাই। তোমাদের কথা বলি। একটা রহস্যের সমাধান করতে ভেতরে ঢুকেছ তোমরা। বিপদ হতে পারে। তারা প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। তবে একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারল না। ইতস্তত করতে করতে তারা এগোল সামনে। আমিও এগোলাম।

'জানালায় এসে দাঁড়াতেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে পেলাম আমরা। বিস্মিত হয়ে দেখলাম তোমরা দু'জন একযোগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছ। ওদিকে শী লিজ দৌড়ে কেবিনেটের কাছে চলে গেল। দ্রুত হাতে বের করে নিয়ে এল মিসেস ফিয়োনার মুকুট।

'এতক্ষণে হুঁশ হয়েছে দুই পুলিশের। "মনে হচ্ছে পালাবে ওরা এখন," বলল ওদের একজন। "আমি ব্যাকডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকছি, তুমি ছেলেটাকে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়াও," অন্য পুলিশের উদ্দেশে বলেই সে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল।

'তারপর যা হবার তাই হলো। ব্যাকডোর দিয়ে পালানোর সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল শী লিজ আর তার স্ত্রী। এরমধ্যে আরও একগাড়ি পুলিশ এসে হাজির হলো।

'হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেল তারা শী লিজকে। যাওয়ার আগে সে তার অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে জানিয়েছে হংকং-এর অকশন থেকে মুকুটটা কিনতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই জিঙ ওটা হাতানোর তালে ছিল। ভাগ্যক্রমে মিসেস ফিয়োনা জনসন যেখানে থাকেন, সেই নিউপোর্ট বীচেই তার বাড়ি। তাই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার অনেক সময় পেল সে। পরিকল্পনা করতে লাগল। মিসেস ফিয়োনা কয়েকদিনের জন্যে শহরের বাইরে গেলে সুযোগটা কাজে লাগাল সে। মুকুটটা চুরি করার পরপরই সে সীগালের এক পোর্টারের কাছ থেকে আমাদের কথা জানতে পারল। আমরা গোয়েন্দা শুনে ভড়কে গেল সে। একদিনের মধ্যেই তৈরি করিয়ে নিল প্রায় হুবহু আরেকটা ডামি। মিসেস ফিয়োনা ফিরে আসার আগেই ওটা রেখে এল তাঁর কেবিনেটে যাতে কেউ ধরতে না পারে ওটা চুরি গেছে। তারপরও সন্তুষ্ট হতে পারল না সে। বিষ লাগিয়ে এল নকল মুকুটে। এখানে একটু ঝুঁকি নিতে হয়েছে তাকে। কারণ মুকুটের বিষ আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই যদি ওটা কিমের মাথায় পরিয়ে দেয়া হত, তাহলে কি ঘটত তা সবার জানা। কিন্তু জিঙ নিশ্চিত ছিল তার আগেই আমরা বিষাক্রান্ত হয়ে মারা পড়ব।

'জিঙের দেশী বন্ধু শী লিজ প্রথম থেকেই চাইছিল স্টেলা গর্ডন নয়, জুভেনাইল অভ দ্য ইয়ার শিরোপা জিতুক কিম ইঙ চাক। আর তাই সে তার ঘনিষ্ঠ দেশী বন্ধু ইয়াঙ জিঙকে অনুরোধ করে স্টেলা যাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে। পরে তাই করেছিল জিঙ। কিন্তু মুকুটে বিষ মাখিয়ে সে খানিকটা চিন্তায় ছিল—যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায় কিমের…!' থামল রবিন।

'ক্যাপ্টেনটা কে জানা গেছে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন। 'প্রাক্তন এক কুঁজো নাবিক। টাকার বিনিময়ে সে সব করতে পারে। ইয়াঙ জিঙ ভাড়া করেছিল তাকে। কিন্তু লোকটা জিঙের অনলিস্টেড ফোন নম্বর ভুলে যায়। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'আমাদের গাড়ি চুরি করেছিল কে?' মুসা জানতে চাইল।

'সীগালের নতুন সেই পোর্টার। লোকটাকে নিজেদের ইনফর্মার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে জিঙ কায়দা করে পোর্টারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। ব্যাটা নাকি জেল পলাতক আসামী। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসেছে।'

এরমধ্যে ঘরে এসে ঢুকল বিশাল এক দল। রিয়া, রিক, স্টেলা, সুইঙ, মিসেস ম্যাডোনা, ফিয়োনা জনসন এবং একদল প্রতিযোগী।

'শাবাশ তিন গোয়েন্দা!' ঢুকেই বলে উঠল রিয়া। 'এমন জটিল এক রহস্যের সমাধান সম্ভব হয়েছে শুধু তোমাদের জন্যে।'

'কোথায় হলো?' হাসল কিশোর স্টেলা গর্ডনের দিকে তাকিয়ে। 'আসল রহস্যের সমাধান তো এখনও হয়নি।'

হ্যাঁ, সব রহস্যের সমাধান হবে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার পর।

***